উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

টুনটুনির বই

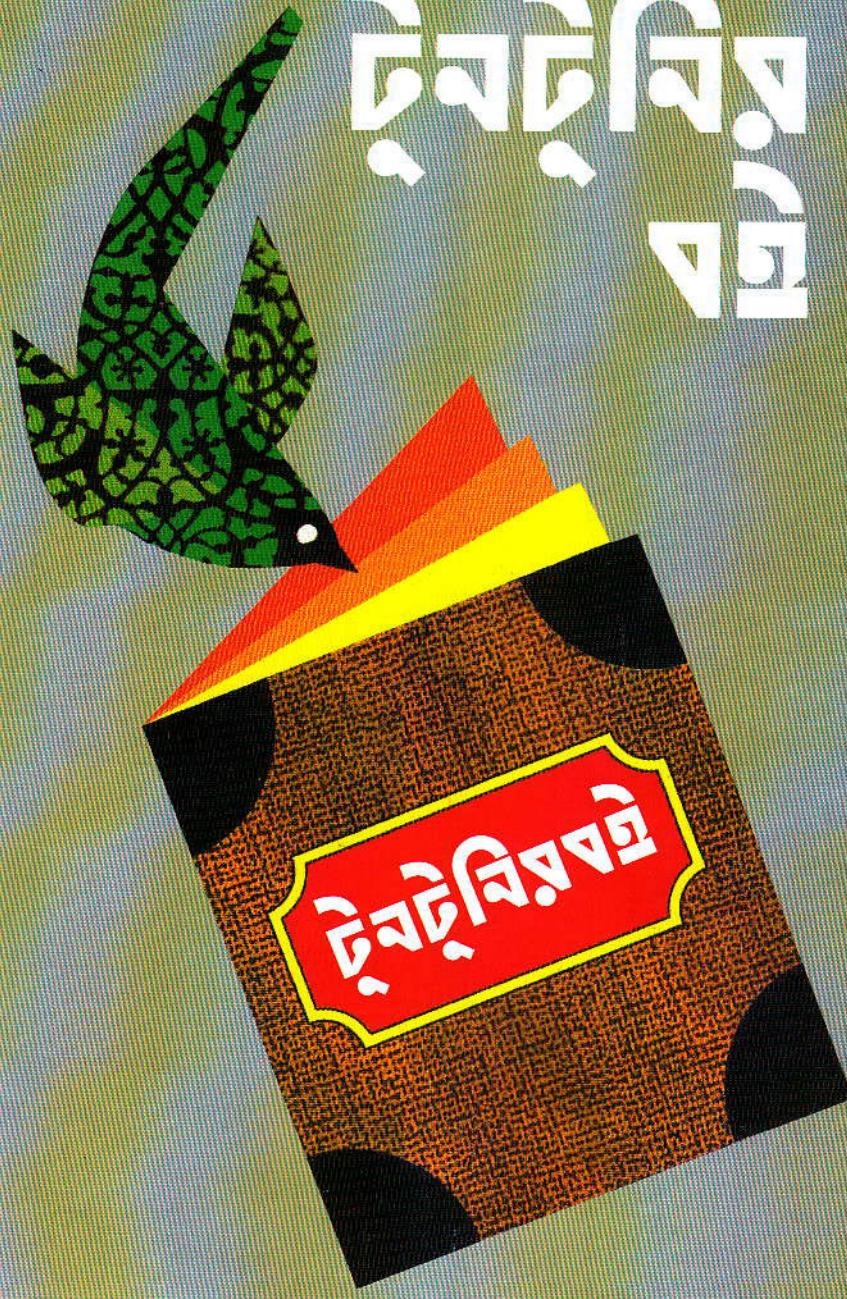

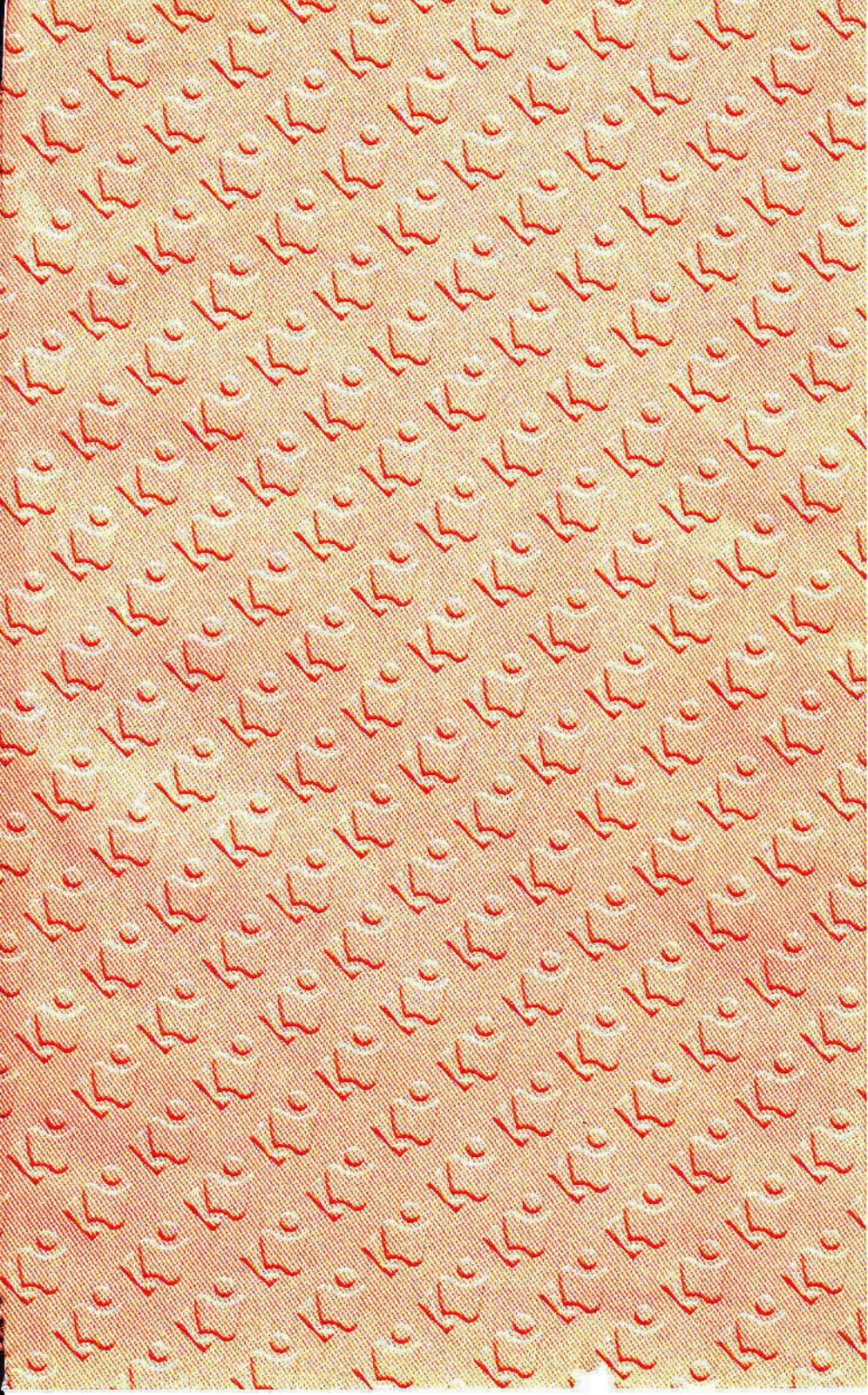

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

টুনটুনির বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৬৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

চতুর্থ সংস্করণ নবম মুদ্রণ
চৈত্র ১৪১৮ এপ্রিল ২০১২

প্রকাশক
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
নলিনী দাস সম্পাদিত উপেন্দ্রকিশোর রচনা সমগ্র-তে
ব্যবহৃত লেখকের আঁকা ছবি

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0163-9

ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রায় কেউই শিশুসাহিত্যকে এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ফলে সমগ্র বাংলাসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুসাহিত্যের অবস্থান কোথায়, শিশুসাহিত্য কাদের অবদানে সমৃদ্ধ, এ-ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের কৃতিত্বই-বা কী সে-সব নিয়ে কোনো সামগ্রিক পর্যালোচনা হবার সুযোগ ঘটে নি।

সাধারণ অর্থে অবশ্য শিশুদের মনোরঞ্জন করতে পারাটাকেই শিশুসাহিত্যের লেখকদের সার্থকতা বলে ধরে নেয়া যায়। তা সত্ত্বেও, এ-কথা বলতে কোনো অসুবিধা নেই যে শিশুসাহিত্যিককে শুধু শিশুমনোরঞ্জক হলেই চলে না; তাঁর দায়িত্ব বয়স্ক মানুষের মধ্যে সুপ্ত যে-শিশুটির অবস্থান তারও মনোরঞ্জন করা। বয়স্ক মানুষের পরিণত উপলব্ধিতেও শিশুসাহিত্য একটা গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। সোজাসাপটা বলা যেতে পারে যে, যে শিশুসাহিত্য একই সঙ্গে শিশুমনোরঞ্জক হয়েও পরিণত মানুষের মধ্যেকার শিশুমনের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম তা মহত্তর শিশুসাহিত্য। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) বাংলা শিশুসাহিত্যের এমনই একজন উঁচুমানের লেখক। শিশুমনোরঞ্জনী গুণসম্পন্ন সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন বাংলা শিশুসাহিত্যের সীমানা কতদূর ও কেমন হতে পারে। নিজে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে এবং *সন্দেশ* পত্রিকার মাধ্যমে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে তিনি আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুল্য। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার সৃজন-মননশীলতার ক্ষমতাকে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন *সন্দেশ* পত্রিকার মধ্য দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষমতা ও সীমানাকে কিছুটা সেভাবেই সম্প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কী কী গুণ একজন যথার্থ শিশুসাহিত্যিকের প্রয়োজন তা একটু পর্যালোচনা করে দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে একজন সাহিত্যিকের লেখা এমন গুণসম্পন্ন হতে হবে যাতে ছোটদের খুশি হবার উপকরণ তাতে থাকে। একই সঙ্গে তাকে আবার বড়দের মনের চাহিদা মেটাতেও সক্ষম হতে হবে। শিশুসাহিত্য আস্বাদন করে শুধু ছোটরা খুশি হলেই চলবে না (কারণ ছোটদের বিচারবোধ নেই বলে শুধু চাকচিক্যে তারা ভুলে যায়। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সাহিত্যও তাদের কাছে আদর পেতে পারে)। অন্যদিকে

সহানুভূতিশীল বড়দের মধ্যেকার শিশুমন একই সঙ্গে যেমন খুশি হতে পারে তেমনি বিচারও করে নিতে পারে। সুতরাং যে-সাহিত্য এই দুইকে মেলাতে পারে না তাকে যথার্থ উন্নত শিশুসাহিত্য বলা যায় কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সহানুভূতিশীল বড়দের খুশি করতে গিয়ে ছোটদের ইচ্ছে-খুশির পৃথিবী যদি আবার উপেক্ষিত থেকে যায় তাহলেও শিশুসাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ শিশুর মন জোরাজুরিকে সহ্য করতে পারে না। আদর, স্নেহ ও মমতার মধ্য দিয়ে শিশুসাহিত্যের স্রষ্টাকে শিশুদের কাছে পৌছতে হয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) প্রমুখের হাতে আধুনিক শিশুসাহিত্যের সূচনা ঘটবার আগেও অখণ্ড বাংলায় শিশুসাহিত্য-অনুষঙ্গের উপস্থিতি ছিল প্রাচীন কাহিনী-কাব্য, লোককথা, উপকথা, পুরাণ ইত্যাদির মধ্যে। শিশুসাহিত্যের এইসব উপাদান মানুষের মুখে মুখে পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে শিশুদের কাছে পৌছোত। যুগ যুগ ধরে শিশুদের মন ক্রমে ক্রমে পরিণত মানুষের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতিকে উপলব্ধি করতে শিখেছে এই প্রক্রিয়াতেই। আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে ওঠার শুরুর পর্যায়ে এর নির্মাতারা উপকথা, লোককাহিনী, পুরাণকাহিনী ইত্যাদির কতটুকু শিশু-কিশোরদের মনের পক্ষে সুপাচ্য এবং শ্রেয় তা বিচার করে বুঝতে চেষ্টা করলেন। বুঝলেন, ঐসব লোকসাহিত্যের মধ্য থেকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে একটা উন্নত মূল্যবোধ ও রুচিসম্পন্ন হৃদয়ের অনুকূল অংশকে ছোটদের কাছে তুলে ধরা হবে তাঁদের প্রধান কাজ। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিক বাংলা গদ্যের গঠন যুগে সচেতনভাবে যে স্বল্পসংখ্যক লেখক এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের অবস্থান বিশিষ্ট।

দেশীয় ও পাশ্চাত্য এই দুই অনুভবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তাঁর যে শিল্পীমনটি গড়ে উঠেছিল তার মূল ছিল দেশের মানুষের জীবনধারার মধ্যে। তবে সবকিছুকে বিচার করে দেখার শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানাদর্শের আলোক থেকে। উপেন্দ্রকিশোর বাঙালি শিশু-কিশোরদের জন্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তার কোনো আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না। পাশ্চাত্য জ্ঞান থেকে তিনি এইটুকু শুধু বুঝতে পেরেছিলেন যে ছোটদের সাহিত্যের ভাষা হতে হবে সরল ; প্রয়োজনের বেশি কথা সেখানে থাকলে চলবে না। উপেন্দ্রকিশোরের এই গুণটিকে লীলা মজুমদার শনাক্ত করেছিলেন এইভাবে :

> ছোটদের জন্য লেখার ভাষা হবে অতি সহজ সরল, কিন্তু তাতে ভাঙা-ভাঙা আধো-আধো বুলি থাকবে না। কোনোরকম ন্যাকামি থাকবে না। বাড়তি একটা কথা থাকবে না। যুক্তিশূন্য কোনো বাক্য থাকবে না। রস থাকবে যথেষ্ট। কারণ ভালো না লাগলে পড়ার বই যদি ছোটরা বাধ্য হয়ে পড়ে, বাইরের বই কখনো পড়বে না।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ভুবনটিকে উপেন্দ্রকিশোর তুলনা করে দেখতে চাইতেন তাঁর সমকালের ইয়োরোপের সাহিত্যের ভুবনের সঙ্গে। ইয়োরোপে ছোটদের বই প্রকাশিত

হতো ছবিতে শোভিত হয়ে। সবচেয়ে ভালো কাগজ ব্যবহৃত হতো সে-সব বইয়ে। উপেন্দ্রকিশোর বিলেতি বই দেখেছিলেন প্রচুর। এর মধ্যে অনেক ছোটদের বইও ছিল। বাংলাভাষায় ছোটদের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সে-রকম সৌন্দর্যের অভাব তাঁকে পীড়া দিয়েছিল বলে এর প্রকাশনাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিলেন আর এক শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭)।

ছবি মুদ্রণের উন্নত কলাকৌশল আবিষ্কারের জন্য দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। ঐ বিষয়ে তাঁর গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছিল। বিলেতের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *পেনারোজ এনুয়েল*-এ উন্নত মুদ্রণপদ্ধতি বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পুত্র সুকুমার রায় উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে গিয়ে মুদ্রণপ্রযুক্তিতে পিতার আবিষ্কৃত পদ্ধতির ব্যবহার দেখে এসেছিলেন। ছাপাখানা ও ছবি এনগ্রেভিং বিষয়ে তাঁর দক্ষতা কাজে লাগাবার জন্য ১৮৯৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠা করলেন ছাপাখানা *ইউ রায় অ্যান্ড সন্স*। এই প্রেসে যত্ন করে ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় ছবি সম্বলিত উন্নতমানের বই প্রকাশিত হতে লাগল।

উপেন্দ্রকিশোরের রচনা সংখ্যায় তেমন বেশি নয়, কিন্তু গুরুত্বে অপরিসীম। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নিজেদের সংস্কৃতির ভিত্তি কিসের ওপর গড়ে উঠেছে। বুঝেছিলেন এই সংস্কৃতিকে বুঝবার জন্য ভারতীয় দুই মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর গল্প প্রতিটি বাঙালির জানা দরকার। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* ও কাশীরাম দাসের *মহাভারত* আয়তনের বিশালত্ব এবং শব্দের গুরুভারত্বের কারণে ছোটদের কাছে দুষ্পাচ্য। কিন্তু যদি এসবের আড়াল থেকে এর মূল কাহিনী এবং মহত্ত্বের দিকগুলো ছোটদের কাছে তুলে ধরা যায় তাহলেও সেগুলো ছোটদের মনোগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ-কথা বুঝেই এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছিলেন তিনি। আজ তাঁর লেখা *ছেলেদের রামায়ণ* (১৮৯৬) আর *ছেলেদের মহাভারত* (১৮৯৭)-এর মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে এই দুই মহাকাব্যের মহত্ত্ব কেবল ছোটদেরই নয় সকলের নাগালের মধ্যে আসতে পেরেছে।

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা থেকে যে-সব গল্প উঠে এসেছে সেগুলো আমাদের সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। এগুলোকে ছোটদের মানসগঠনের উপযোগী করে পরিবেশন না করলে ভবিষ্যতের শিশুরা এর রস থেকে বঞ্চিত হবে। এই অনুভব থেকেই তিনি লিখেছিলেন *টুনটুনির বই*। চিরকালের লোককাহিনীগুলোকে কী অপরূপ নিষ্পাপ ভাষায় ছোটদের জন্য তিনি লিখেছিলেন তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। আরো বিস্ময়ের কারণ এর ভাষাভঙ্গি। একালের লেখকদের ভাষারই মতো আধুনিক ও সুস্বাদু এই ভাষা। *টুনটুনির বই* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে। বইয়ের ছবিগুলোও তাঁর নিজেরই আঁকা। এ-বিষয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> গল্পগুলো কেবল পূর্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও প্রচলিত। গল্পগুলির উপজীব্য বাংলার কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলের নয়। রচনায় উপেন্দ্রকিশোর নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেছেন বলেই মনে হয়। সাজ-পোশাক নেই, ছিমছাম আটপৌরে উপজীব্যকে

সাজিয়েছেন তিনি। ...'টুনটুনির বই'-এর গল্পগুলির উদ্ভব পল্লীবাংলায় এবং রচয়িতাগণ ছিলেন সাধারণ ঘরের মানুষ। সেজন্য সাধারণ গৃহস্থ ও চাষী-মজুরের চিত্র এতে সহজভাবে অঙ্কিত। মনে হয়, এগুলি শিশুদের জন্যই রচিত হয়।

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকারেরা শিশুসাহিত্য ব্যাপারটিকে তাঁদের বিবেচনায় না আনবার ফলে বাৎসল্য-রসকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে বাংলাগদ্যের যে ধারাবাহিক অগ্রযাত্রার ইতিহাস রয়েছে তা সকলের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে নি। বাংলাগদ্যের বিকাশের ইতিহাসে তাই *বালকবন্ধু* (১৮৭৮), *সখা* (১৮৮৩), *বালক* (১৮৮৫), *সাথী* (১৮৯৩), *সখা ও সাথী* (১৮৯৪), *মুকুল* (১৮৯৫), *সন্দেশ* (১৯১৩) প্রভৃতি মাসিকপত্রের ভূমিকার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। একইভাবে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত উপেন্দ্রকিশোরের শিশুসাহিত্যও।

ছোটবেলা থেকে তিনি সঙ্গীত এবং চিত্রকলারও চর্চা করেছেন। পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, সেতার, বাঁশি ও বেহালা বাজাতে পারতেন। বেহালাবাদন ছিল বিশেষ প্রিয়। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবগুলোতে তিনি বেহালা-সংগত করতেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও ভালো ধারণা ছিল তাঁর। *সাধনা* ও *প্রবাসী* পত্রিকাতে প্রায়শই সঙ্গীত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। *বেহালা শিক্ষা* (১৯০৪) ও *হারমোনিয়াম শিক্ষা* (১৯০৫) বইদুটি তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক উৎসাহের প্রমাণ।

চিত্রাঙ্কনেও তাঁর সৃষ্টিশীলতার পরিচয় আছে। চিত্রশিল্পী হিসেবে তিনি পাশ্চাত্যানুসারী। তবে ছোটদের বইয়ে তাঁর আঁকা ছবিগুলো একালের পাঠককেও আনন্দ দেয়।

মৃত্যুর অনেক পরে লোকগল্পের আরেকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর; নাম : *গুপী গাইন বাঘা বাইন* (১৯৬৩)। *সে কালের কথা* (১৯০৩) নামে একটি বিচিত্রস্বাদের বইও লিখেছিলেন। গাছপালা, পশু-পাখি, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাচীনকাল, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের অতীত-বর্তমানের কাহিনী, আবিষ্কার কাহিনী ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের লেখার সংকলন এই বইটি। বাংলা শিশুসাহিত্য ভুবনে নিজের লেখা, নিজের আঁকা, নিজের ছাপাখানায় উন্নত মুদ্রণব্যবস্থায় ছাপা এমন বই এর আগে প্রকাশিত হয় নি।

আহমাদ মাযহার

নভেম্বর ২০০১

গ্রন্থকারের নিবেদন

সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এইগুলি ভালো লাগিবে।

কলিকাতা
১৩১৭

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সূচি

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা ১৩
১৪ টুনটুনি আর নাপিতের কথা
১৬ টুনটুনি আর রাজার কথা
১৯ নরহরি দাস
২১ বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে
২২ বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা
২৭ কুঁজো বুড়ির কথা
২৯ উকুনে-বুড়ির কথা
৩৩ পান্তাবুড়ির কথা
৩৫ চড়াই আর কাকের কথা
৩৭ চড়াই আর বাঘের কথা
৩৯ দুষ্ট বাঘ
৪২ বাঘ-বর
৪৫ বাঘের উপর টাগ
বাঘের পালকি চড়া ৪৮
বুদ্ধুর বাপ ৫০
বোকা বাঘ ৫৪
বাঘের রাঁধুনি ৫৭
বোকা কুমিরের কথা ৫৮
শিয়াল পণ্ডিত ৫৯
সাক্ষী শিয়াল ৬২
বাঘখেকো শিয়ালের ছানা ৬৪
আখের ফল ৬৬
হাতির ভিতরে শিয়াল ৬৭
মজন্তালী সরকার ৬৮
পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর ৭২
পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা ৭৭

টুনটুনি আর বিড়ালের কথা

গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুনগাছ আছে। সেই বেগুনগাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে ছোট্ট-ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না, চোখও মেলতে পারে না। খালি হাঁ করে, আর চিঁ-চিঁ করে।

গৃহস্থের বিড়ালটি ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে, 'টুনটুনির ছানা খাব।' একদিন সে বেগুনগাছের তলায় এসে বললে, 'কী করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারানি!'

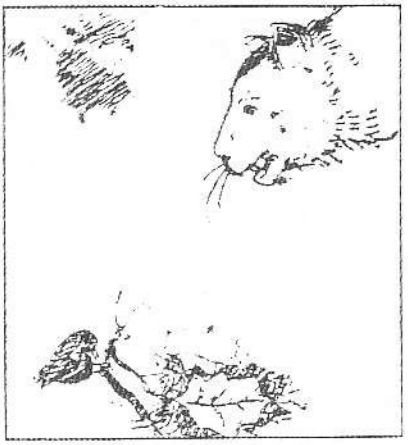

প্রণাম হই মহারানি!

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল।

এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারানি বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে, 'বাছা, তোরা উড়তে পারবি?'

ছানারা বললে, 'হ্যাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে, 'তবে দেখ তো দেখি, ঐ তালগাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কিনা!'

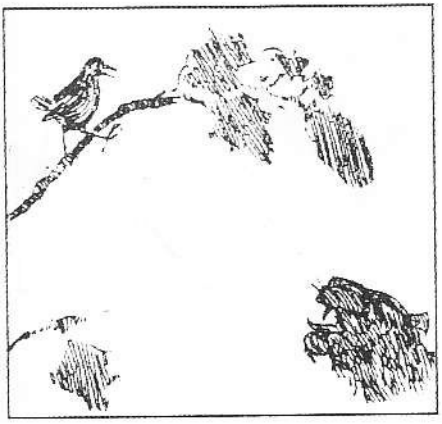

দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী

ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তালগাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে, 'এখন দুষ্টু বিড়াল আসুক দেখি!'

খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে, 'কী করছিস লা টুনটুনি?'

তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী!' বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল।

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে টুনটুনিকেও ধরতে পারল না, ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন-কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।

টুনটুনি আর নাপিতের কথা

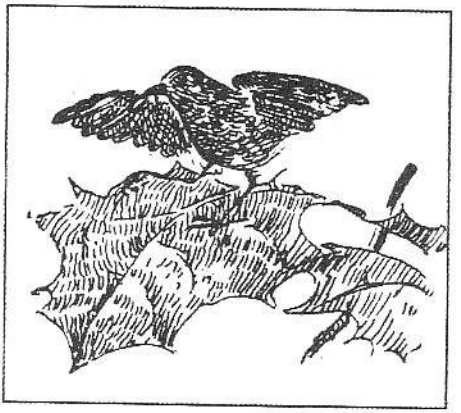

টুনটুনি বেগুন গাছে নাচছে

টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন-পাতায় বসে নাচতে। নাচতে-নাচতে খেল বেগুন-কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোঁড়া।

ও মা, কী হবে? এতবড় ফোঁড়া কী করে সারবে?

টুনটুনি একে জিগগেস করে, তাকে জিগগেস করে। সবাই বললে, 'ওটা নাপিত দিয়ে কাটিয়ে ফেল।'

তাই টুনটুনি নাপিতের কাছে গিয়ে বললে, 'নাপিতদাদা, নাপিতদাদা, আমার ফোঁড়াটা কেটে দাও না!'

নাপিত তার কথা শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে নাক সিটকিয়ে বললে, 'ইশ্! আমি রাজাকে কামাই, আমি তোর ফোঁড়া কাটতে গেলুম আর কী!'

টুনটুনি বললে, 'আচ্ছা দেখতে পাবে এখন, ফোঁড়া কাটতে যাও কিনা!'

বলে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলে, 'রাজামশাই, আপনার নাপিত কেন আমার ফোঁড়া কেটে দিচ্ছে না? ওকে সাজা দিতে হবে।'

শুনে রাজামশাই হো-হো করে হাসলেন, বিছানায় গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে কিছু বললেন না। তাতে টুনটুনির ভারি রাগ হল।

নাপিত আর টুনটুনি

সে ইঁদুরের কাছে গিয়ে বললে, 'ইঁদুরভাই, ইঁদুরভাই, বাড়ি আছ?'

ইঁদুর বললে, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বললে, 'তবে ভাত খাই, যদি এক কাজ কর।'

ইঁদুর বললে, 'কী কাজ?'

টুনটুনি বলল, 'রাজামশাই যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, তখন গিয়ে তাঁর ভুঁড়িটা কেটে ফুটো করে দিতে হবে।'

তা শুনে ইঁদুর জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, 'ওরে বাপরে! আমি তা পারব না!' তাতে টুনটুনি যারপরনাই রাগ করে বিড়ালের কাছে গিয়ে বলল, 'বিড়ালভাই, বিড়ালভাই, বাড়ি আছ?'

বিড়াল বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি ইঁদুর মার।'

বিড়াল বলল, 'এখন আমি ইঁদুর-টিদুর মারতে যেতে পারব না, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।' শুনে টুনটুনি রাগের ভরে লাঠির কাছে গিয়ে বলল, 'লাঠিভাই, লাঠিভাই, বাড়ি আছ?'

লাঠি বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি বিড়ালকে ঠেঙাও।'

লাঠি বলল, 'বিড়াল আমার কী করেছে যে আমি তাকে ঠেঙাতে যাব? আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি আগুনের কাছে গিয়ে বলল, 'আগুনভাই, আগুনভাই, বাড়ি আছ?'

আগুন বলল, 'কে ভাই? টুনি ভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি লাঠি পোড়াও।'

আগুন বলল, 'আজ ঢের জিনিস পুড়িয়েছি, আজ আর কিছু পোড়াতে পারব না।' তাতে টুনটুনি তাকে খুব করে বকে, সাগরের কাছে গিয়ে বলল, 'সাগরভাই, সাগরভাই, বাড়ি আছ?'

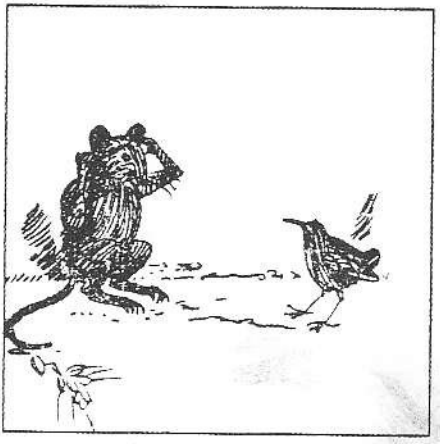

ইঁদুর আর টুনটুনি

সাগর বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি তুমি আগুন নেবাও।'

সাগর বলল, 'আমি তা পারব না।' তখন টুনটুনি হাতির কাছে গিয়ে বলল, 'হাতিভাই, হাতিভাই, বাড়ি আছ?'

হাতি বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি সাগরের জল সব খেয়ে ফেল।'

হাতি বলল, 'অত জল খেতে পারব না, আমার পেট ফেটে যাবে।'

কেউ তার কথা শুনল না দেখে টুনটুনি শেষে মশার কাছে গেল। মশা দূর থেকে তাকে দেখেই বলল, 'কে ভাই? টুনিভাই? এস ভাই! বস ভাই! খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?'

টুনটুনি বলল, 'তবে ভাত খাই, যদি হাতিকে কামড়াও।'

মশা বলল, 'সে আবার একটা কথা! এখুনি যাচ্ছি। দেখব হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া!' বলে, সে সকল দেশের সকল মশাকে ডেকে বলল, 'তোরা আয় তো রে ভাই, দেখি হাতি বেটার কত শক্ত চামড়া।' অমনি পিন্-পিন্-পিন্-পিন্ করে যত রাজ্যের মশা,

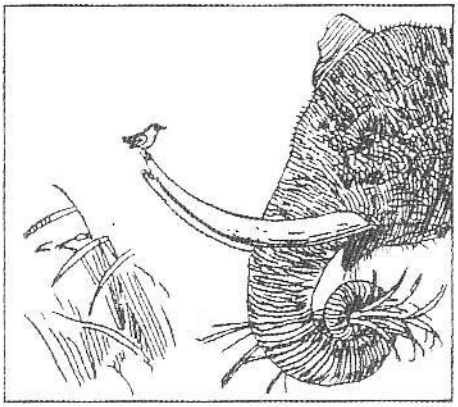

হাতি আর টুনটুনি

বাপবেটা ভাইবন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পিন্-পিন্-পিন্-পিন্ ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল। তখন—

হাতি বলে, সাগর শুষি!
সাগর বলে, আগুন নেবাই!
আগুন বলে, লাঠি পোড়াই!
লাঠি বলে, বেড়াল ঠেঙাই!
বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি!
ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি!
রাজা বলে, নাপিত বেটার মাথা কাটি!

নাপিত হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'রক্ষে কর টুনিদাদা! এস তোমার ফোঁড়া কাটি!'

তারপর টুনটুনির ফোঁড়া সেরে গেল, আর সে ভারি খুশি হয়ে আবার গিয়ে নাচতে আর গান গাইতে লাগল—টুনটুনা টুন্ টুন্ টুন্! থেই থেই!

টুনটুনি আর রাজার কথা

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল।

টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিল, আর ভাবল, 'ইশ্! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি! রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

'রাজার ঘরে যে ধন আছে,
টুনির ঘরে সে ধন আছে!'

রাজা তাঁর সভায় বসে সে-কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে! পাখিটা কী বললে রে?'

সকলে হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, পাখি বললে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!'

শুনে রাজা খিলখিল করে হেসে বললেন, 'দেখ্ তো ওর বাসায় কী আছে!'

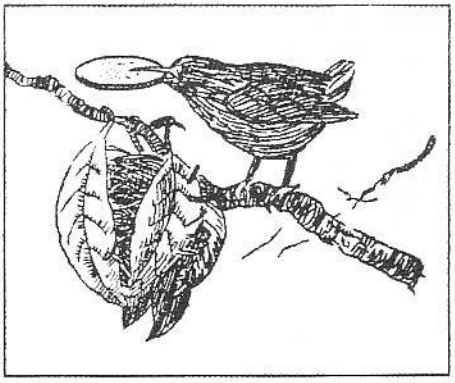

টুনটুনি টাকা নিয়ে তার বাসায় রাখছে

তারা দেখে এসে বলল, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা।'

তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কী করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

'রাজা বড় ধনে কাতর
টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর।'

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

'রাজা ভারি ভয় পেল
টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।'

রাজা জিগগেস করলেন, 'আবার কী বলছে রে?'

সভার লোকেরা বলল, 'বলছে যে মহারাজা নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনেই তো রাজামশাই রেগে একেবারে অস্থির! বললেন, 'কী, এতবড় কথা! আন্ তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই।'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনল। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানিদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে।'

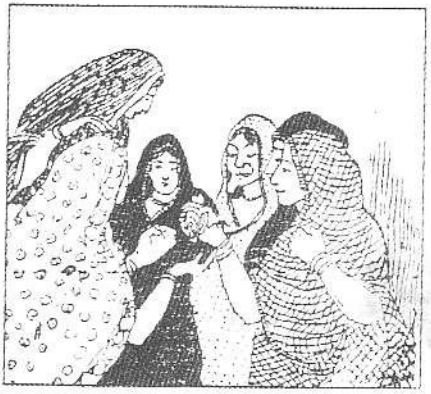

রানিরা টুনটুনিকে দেখছেন

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন।

একজন বললেন, 'কী সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি!' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার আর-একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর-একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফস্‌কে গিয়ে উড়ে পালাল।

কী সর্বনাশ! এখন উপায় কী হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না!

এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপথপ করে যাচ্ছে। সাতরানি তাকে দেখতে পেয়ে খপ্ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে! এইটাকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন।

তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবার পাখির বাছাকে জব্দ করেছি!'

অমনি টুনটুনি বলছে—

'বড় মজা, বড় মজা,

রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা !'

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন ! তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আরও কত কী করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাতরানির নাক কেটে ফেল !'

অমনি জল্লাদ গিয়ে সাতরানির নাক কেটে ফেলল।

তা দেখে টুনটুনি বলল—

'এক টুনিতে টুনটুনাল
সাতরানির নাক কাটাল !'

তখন রাজা বললেন, 'আন্ বেটাকে ধরে ! এবারে গিলে খাব ! দেখি কেমন করে পালায় !'

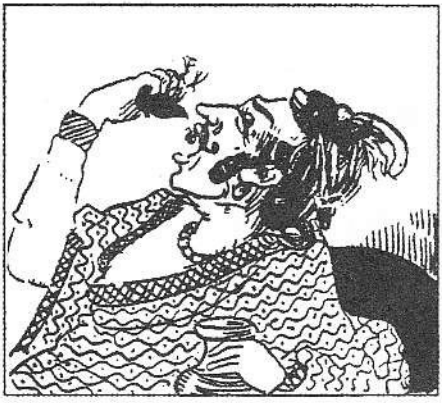

রাজা টুনটুনিকে খেতে যাচ্ছেন

টুনটুনিকে ধরে আনল।

রাজা বললেন, 'আন্ জল !'

জল এল। রাজা মুখভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন।

সবাই বলল, 'এবারে পাখি জব্দ !'

বলতে-বলতেই রাজামশাই ভোক্ করে মস্তবড় একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল ! ধর, ধর !' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে বেচারাকে আবার ধরে আনল।

তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দুই-টুকরো করে ফেলবে।

নাক-কাটা রাজা

এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুইহাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল।

খানিকবাদে রাজামশাই নাক সিঁটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক !' অমনি টুনটুনিকে সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল।

সবাই বলল, 'সিপাই, সিপাই ! মারো, মারো ! পালাল !'

সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে

যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল। রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

'নাক কাটা রাজা রে
দেখ্ তো কেমন সাজা রে !'

বলেই সে উড়ে সে-দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

নরহরি দাস

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানে, একটা গর্তের ভিতরে একটি ছাগলছানা থাকত। সে তখনো বড় হয় নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলেই তার মা বলত, 'যাসনে ! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে !' তা শুনে তার ভারি ভয় হত, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতর বসে থাকত। তারপর সে একটু বড় হল, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এতবড় জন্তু কখনো দেখে নি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এতবড় হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগগেস করল, 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও ?'

ষাঁড় বলল, 'আমি ঘাস খাই।'

ছাগলছানা বলল, 'ঘাস তো আমার মা-ও খায়, সে তো তোমার মতো এতবড় হয় নি !'

ষাঁড় বলল, 'আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।'

ছাগলছানা বলল, 'সে ঘাস কোথায় ?'

ষাঁড় বলল, 'ঐ বনের ভিতরে।'

ছাগলছানা বলল, 'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।' এ-কথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানার পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমন ভারি হল যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধে হলে ষাঁড় বলল, 'এখন চল বাড়ি যাই !'

কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে ? সে চলতেই পারে না।

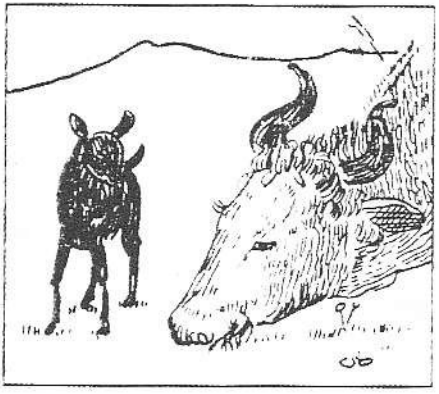

ষাঁড় আর ছাগলছানা

তাই সে বলল, 'তুমি যাও, আমি কাল যাব।'

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটা গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।

সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর কীরকম একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে। এই মনে করে সে ভয়ে ভয়ে জিগগেস করল, 'গর্তের ভিতরে কে ও?'

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বলল—

'লম্বা লম্বা দাড়ি
ঘন ঘন নাড়ি।
সিংহের মামা আমি নরহরি দাস
পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!'

শুনেই তো শিয়াল 'বাবা গো!' বলে সেখান থেকে দে-ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেলল।

বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করল, 'কি ভাগ্নে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মামা, সর্বনাশ তো হয়েছে, আমার গর্তে একটা নরহরি দাস এসেছে! সে বলে কিনা যে পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানক রেগে বলল, 'বটে, তার এত বড় আস্পর্ধা! চল তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

বাঘ শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাচ্ছে

শিয়াল বলল, 'আমি আর সেখানে যেতে পারব না মামা, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তাহলে তুমি তো দুইলাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারব না, আর সে-বেটা আমাকেই ধরে খাবে!'

বাঘ বলল, 'তা-ও কি হয়? আমি কখনো তোমাকে ফেলে পালাব না।'

শিয়াল বলল, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চল।'

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, 'এবারে আর বাঘ মামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।'

এমনি করে তারা শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বলল—

'দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি,
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!'

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে! সে ভাবল যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে

নরহরি দাসকে খেতে দেবার জন্য এনেছে। তারপর সে কি আর সেখানে দাঁড়ায়? সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, ক্ষেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কী! শিয়াল চেঁচিয়ে বলল, 'মামা, আল! মামা, আল!' তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল, তাই সে আরো বেশি করে ছোটে! এমনি করে সারারাত ছুটোছুটি করে সারা হল।

সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।

শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের ওপর তার এমনি রাগ হল যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

বাঘ মামা আর শিয়াল ভাগ্নে

শিয়াল ভাবে, 'বাঘ মামা, দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি!' এখন সে আর নরহরি দাসের ভয়ে তার পুরনো গর্তে যায় না, সে একটা নতুন গর্ত খুঁজে বার করেছে।

সেই গর্তের কাছে একটা কুয়ো ছিল।

একদিন শিয়াল নদীর ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে সেটাকে টেনে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে, সেই কুয়োর মুখের উপর তাকে বেশ করে বিছিয়ে বাঘকে গিয়ে বলল, 'মামা, আমার নতুন বাড়ি দেখতে গেলে না?' শুনে বাঘ তখুনি তার নতুন বাড়ি দেখতে এল। শিয়াল তাকে সেই কুয়োর মুখে বিছানো মাদুরটা দেখিয়ে বলল, 'মামা একটু বস, জলখাবার খাবে।'

জলখাবারের কথা শুনে বাঘ ভারি খুশি হয়ে লাফিয়ে সেই মাদুরের উপর বসতে গেল, আর অমনি সে কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল। তখন শিয়াল বলল, 'মামা, খুব করে জল খাও, একটুও রেখ না যেন!'

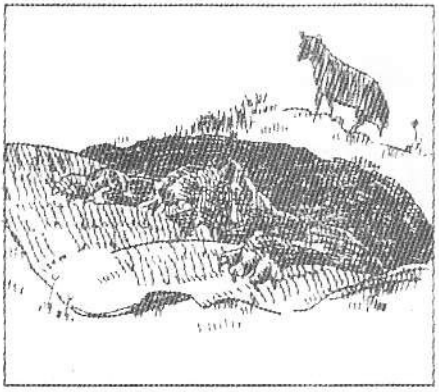

বাঘ কুয়োর ভিতর পড়ে যাচ্ছে

সেই কুয়োর ভিতরে কিন্তু বেশি জল ছিল না, তাই বাঘ তাতে ডুবে মারা যায় নি। সে আগে খুবই ভয় পেয়েছিল, কিন্তু শেষে অনেক কষ্টে উঠে এল। উঠেই সে বলল, 'কোথায় গেলি রে শিয়ালের বাচ্চা? দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি!' কিন্তু শিয়াল তার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, তাকে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

তারপর থেকে বাঘের ভয়ে শিয়াল আর তার বাড়িতেও আসতে পায় না, খাবার খুঁজতেও যেতে পারে না। দূর থেকে দেখতে পেলেই বাঘ তাকে মারতে আসে। বেচারা না-খেয়ে না-খেয়ে শেষে আধমরা হয়ে গেল।

তখন সে ভাবলে, 'এমন হলে তো মরেই যাব! তারচেয়ে বাঘ মামার কাছে যাই না কেন? দেখি যদি তাকে খুশি করতে পারি।'

এই মনে করে সে বাঘের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বাঘের বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকতেই সে খালি নমস্কার করছে আর বলছে, 'মামা, মামা!'

শুনে বাঘ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তাই তো, শিয়াল যে!'

শিয়াল অমনি ছুটে এসে, দু-হাতে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'মামা, আমাকে খুঁজতে গিয়ে তোমার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল, দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল। মামা, আমি তোমাকে বড্ড ভালোবাসি, তাই এসেছি। আর কষ্ট করে খুঁজতে হবে না, ঘরে বসেই আমাকে মার।'

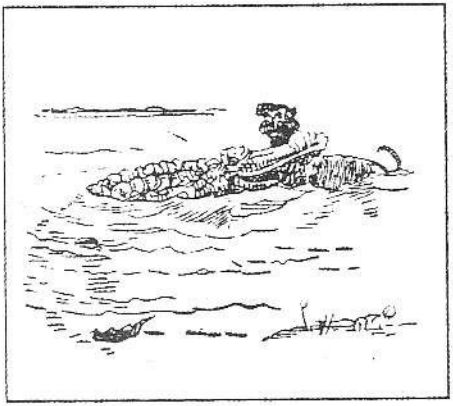

কুমির বাঘকে কামড়ে ধরেছে

শিয়ালের কথায় তো বাঘ ভারি থতমত খেয়ে গেল। সে তাকে মারল না, খালি ধমকিয়ে বলল, 'হতভাগা পাজি, আমাকে কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলি কেন?'

শিয়াল জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বলল, 'রাম-রাম! তোমাকে আমি কুয়োয় ফেলতে পারি? সেখানকার মাটি বড্ড নরম ছিল, তার উপর তুমি লাফিয়ে পড়েছিলে, তাই গর্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমার মতো বীর কি মামা আর কোথাও আছে?'

তা শুনে বোকা বাঘ হেসে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ ভাগ্নে, সে-কথা ঠিক। আমি তখন বুঝতে পারি নি।'

এমনি করে তাদের আবার ভাব হয়ে গেল।

তারপর একদিন শিয়াল নদীর ধারে গিয়ে দেখল যে, বিশহাত লম্বা একটা কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাঘকে বলল, 'মামা, মামা, একটা নৌকো কিনেছি, দেখবে এস!'

বোকা বাঘ এসে সেই কুমিরটাকে সত্যি-সত্যি নৌকো মনে করে লাফিয়ে তার উপরে উঠতে গেল, আর অমনি কুমির তাকে কামড়ে ধরে জলে নিয়ে নামল।

তা দেখে শিয়াল নাচতে-নাচতে বাড়ি চলে গেল।

বোকা জোলা আর শিয়ালের কথা

এক বোকা জোলা ছিল। সে একদিন কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে গিয়ে ক্ষেতের মাঝখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে আবার কাস্তে হাতে নিয়ে দেখল, সেটা বড্ড গরম হয়েছে।

কাস্তেখানা রোদ লেগে গরম হয়েছিল, কিন্তু জোলা ভাবল তার জ্বর হয়েছে। তখন সে 'আমার কাস্তে তো মরে যাবে রে!' বলে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

পাশের ক্ষেতে এক চাষা কাজ করছিল। জোলার কান্না শুনে সে বলল, 'কী হয়েছে?'

জোলা বলল, 'আমার কাস্তের জ্বর হয়েছে।'

তা শুনে চাষা হাসতে হাসতে বলল, 'ওকে জলে ডুবিয়ে রাখ, জ্বর ছেড়ে যাবে।'

জলে ডুবিয়ে কাস্তে ঠাণ্ডা হল, জোলাও খুব সুখী হল।

তারপর একদিন জোলার মা-র জ্বর হয়েছে। সকলে বলল, 'বদ্যি ডাকো।' জোলা বলল, 'আমি ওষুধ জানি।' বলে, সে তার মাকে পুকুরে নিয়ে জলের ভিতরে চেপে ধরল। সে বেচারি যতই ছটফট করে জোলা ততই আরো চেপে ধরে, আর বলে, 'রোস, এই তো জ্বর সারছে।'

কাস্তের জ্বর হয়েছে

তারপর যখন বুড়ি আর নড়ছে-চড়ছে না, তখন তাকে তুলে দেখে সে মরে গেছে। তখন জোলা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। তিনদিন কিছু খেল না, পুকুরপাড় থেকে ঘরেও গেল না।

এক শিয়াল সেই জোলার বন্ধু ছিল। সে জোলাকে কাঁদতে দেখে এসে বলল, 'বন্ধু, তুমি কেঁদো না, তোমাকে রাজার মেয়ে বিয়ে করাব।'

শুনে জোলা চোখ মুছে ঘরে গেল। তারপর থেকে সে রোজ শিয়ালকে বলে, 'কই বন্ধু, সেই যে বলেছিলে?'

শিয়াল বলল, 'যখন বলেছি, তখন করাবই। আগে তুমি খানকতক খুব ভালো কাপড় বুনো গে দেখি।'

জোলা দু-মাস খালি কাপড়ই বুনল। তারপর শিয়াল তাকে খুব করে সাবান মেখে স্নান করতে বলে, রাজার কাছে মেয়ে চাইতে বেরুল।

কানে কলম গুঁজে, পাগড়ি এঁটে, জামা-জুতো পরে, চাদর জড়িয়ে, ছাতা বগলে করে, শিয়াল যখন রাজার নিকট উপস্থিত হল তখন রাজামশাই ভাবলেন, এ খুব পণ্ডিত লোক হবে। তিনি জিগগেস করলেন, 'কি শিয়াল পণ্ডিত, কীজন্যে এসেছ?'

শিয়াল বলল, 'মহারাজ, আমাদের রাজার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন কিনা তাই জানতে এসেছি।'

শিয়াল মিছে কথা বলে নি, সেই জোলার নাম ছিল 'রাজা'। কিন্তু রাজামশাই মনে করলেন বুঝি সত্যি-সত্যিই রাজা। তিনি ব্যস্ত হয়ে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের রাজা কেমন?'

শিয়াল বলল—

'দেখতে রাজা বড়ই ভালো
ঘরময় তার চাঁদের আলো।
বুদ্ধি তার আছে যেমন
লেখাপড়া জানে তেমন।
এক ঘায় তার দশটা পড়ে
তার গুণে লোক খায় পরে।'

সত্যি-সত্যিই সে জোলা দেখতে ভারি সুন্দর ছিল, তাই শিয়াল বলল, 'দেখতে বড় ভালো।'

তার ঘরে চাল ছিল না বলে ভিতরে চাঁদের আলো আসত, তাই শিয়াল বলল, 'ঘরময় চাঁদের আলো।' কিন্তু রাজামশাই ভাবলেন, বুঝি সেটা তাঁর নিজের বাড়ির মতন খুব ঝকঝকে জমকালো একটা বাড়ি।

বুদ্ধি তার ছিল না, আর সে লেখাপড়াও জানত না। কাজেই শিয়াল বলল, 'বুদ্ধি তার আছে যেমন, লেখাপড়া জানে তেমন।' কিন্তু রাজা ভাবলেন, তার ভারি বুদ্ধি, সে ঢের লেখাপড়া জানে।

'এক ঘায় তার দশটা পড়ে'—এ-কথাও সত্যি। দশটা মানুষ নয়, দশটা ধানের গাছ। সে চাষা ছিল, কাস্তে নিয়ে ধান কাটত। রাজামশাই কিন্তু ভাবলেন, সে মস্ত বড় বীর, তার এক ঘায় দশজন মানুষ মরে যায়।

সে ধানের চাষ করত আর কাপড় বুনত। ধান থেকেই তো ভাত হয়; তাই লোকে খায়, আর কাপড় পরে। তাই শিয়াল বলল, 'তার গুণে লোক খায় পরে।' রাজামশাই কিন্তু সেইরকম বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন বুঝি সে ঢের গরিব লোককে খেতে পরতে দেয়।

কাজেই তিনি খুব খুশি হয়ে শিয়ালকে এক হাজার টাকা বকশিশ দিলেন, আর বললেন, 'এমন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না তো কার সঙ্গে দেব? তোমার রাজাকে নিয়ে এস, আটদিনের পর বিয়ে হবে।'

শিয়াল সেই হাজার টাকার থলে বগলে করে নাচতে-নাচতে জোলার কাছে এল। এসে দেখে, জোলা খালি কাপড়ই বুনছে। দু-মাসে সে এত কাপড় বুনেছে যে সেই গ্রামের সকলের এক-একখানি করে কাপড় হতে পারে।

শিয়াল সেই টাকার থলে থেকে দুটি করে টাকা আর এক-একখানি কাপড় গ্রামের সকলকে দিয়ে বলল, 'আটদিন পরে রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুর বিয়ে হবে, আপনাদের নিমন্ত্রণ।' শুনে তারা ভারি খুশি হল। জোলা বোকা হলেও বড় ভালোমানুষ ছিল, তাই সকলে তাকে ভালোবাসত।

তারপর শিয়াল আর-সব শিয়ালের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাইসকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।' শুনে শিয়াল সব হোয়া-হোয়া করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব!'

তারপর শিয়াল ব্যাঙদের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাইসকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।'

সকল ব্যাঙ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব!'

তারপর শিয়াল শালিকদের কাছে গিয়ে বলল, 'ভাইসকল, আমার বন্ধুর বিয়ে, তোমাদের নিমন্ত্রণ। তোমরা গান গাইতে যাবে।'

শালিকের দল কিচিরমিচির করে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব!'

তারপর শিয়াল হাঁড়িচাঁচাদের কাছে, ঘুঘুদের কাছে, কুঁকো পাখিদের কাছে, উৎক্রোশ পাখিদের কাছে, বৌ-কথা-ক-দের কাছে, ময়ূরদের কাছে, চোখ-গেলদের কাছে, আর ভগদত্তদের কাছে গিয়েও তেমনি করে নিমন্ত্রণ করে এল। তারা সবাই বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব, যাব!'

এসব কাজ শেষ হতে সাতদিন লাগল। তার পরের দিন রাত্রিতে বিয়ে। শিয়াল তার বন্ধুর জন্যে চমৎকার পোশাক ভাড়া করে এনে যখন সেই পোশাক তাকে পরিয়ে দিলে, তখন সত্যি-

সত্যিই তাকে খুব বড় একটা রাজার মতন মনে হতে লাগল। যাদের নিমন্ত্রণ, তারাও সবাই এল। যাবার সময় হলে, শিয়াল তাদের সকলকে নিয়ে রাজার বাড়ি চলল।

রাজার বাড়ি যখন এক ক্রোশ দূরে আছে, তখন শিয়াল সকলকে ডেকে বলল, 'ভাইসকল, ঐ দেখ রাজার বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। তোমরা ঐ আলো দেখে খুব ধীরে ধীরে এস। আমি ততক্ষণে ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে খবর দি।'

সবাই বলল, 'আচ্ছা!'

শিয়াল বলল, 'তবে একবার তোমরা সবাই মিলে গান ধরো তো! দেখি কার কেমন গলার জোর!' অমনি পাঁচ হাজার শিয়াল মিলে চ্যাঁচাতে লাগল, 'হুয়া, হুয়া, হুয়া!'

বারো হাজার ব্যাঙ বলল, 'ঘোঁৎ, ঘোঁৎ, ঘেঁয়াও, ঘেঁয়াও!'

সাত হাজার শালিক বলল—

'ফড়িং সঙ্গে সঙ্গে চারিজনং
চকিৎ কাট কাট কাট গুরুচরণ!'

দু-হাজার হাঁড়িচাঁচা বলল, 'ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা, ঘ্যাঁচা!'

চার হাজার ঘুঘু বলল, 'রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু!'

তিন হাজার কুঁদ্ধো বলল, 'পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ, পুৎ!'

উনিশ-শো উৎক্রোশ বলল, 'হাঁ আঃ, হাঁ আঃ, হাঁ আঃ, ও হো হো হো হো!'

আর যত বৌ-কথা-ক, ময়ূর, ভগদত্ত আর চোখ-গেল, তারাও সবাই মিলে যার-যার গান ধরতে ছাড়ল না।

তখন শুনতে কেমন হয়েছিল তা সেখানে থাকলে বোঝা যেত। রাজার বাড়ির লোকেরা দূর থেকে তা শুনে তো ভয়ে কাঁপতেই লাগল। তারপর যখন শিয়াল রাজামশাইকে খবর দিতে এল, তখন তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'শিয়াল পণ্ডিত, ওটা কিসের গোলমাল?'

শিয়াল বলল, 'ওটা আমাদের বাজনা আর লোকজনের শব্দ।'

শুনে রাজা তো ভয়ে অস্থির হলেন। এত লোককে কোথায় বসাবেন, কী দিয়ে খাওয়াবেন, ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। শিয়ালকে বললেন, 'তাই তো, কী হবে?'

শিয়াল বলল, 'ভয় কী মহারাজ! আমি এখুনি গিয়ে লোকজন সব ফিরিয়ে দিচ্ছি। খালি রাজাকে আপনার কাছে আনব।'

রাজা তখন বড়ই খুশি হয়ে শিয়ালকে পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিলেন। শিয়াল ফিরে এসে মাঠের মাঝখানে অনেক টাকার মুড়ি মুড়কি, আর ছোট-ছোট মাছ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা খাও।' অমনি তার সঙ্গে সব শিয়াল, ব্যাঙ আর পাখি মিলে কাড়াকাড়ি করে সে-সব খেতে লাগল। শিয়াল তার গ্রামের লোকদের প্রাণভরে সন্দেশ খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর জোলাকে নিয়ে রাজার কাছে এল। আসবার সময় তাকে শিখিয়ে আনল, 'খবরদার! কথা বলো না যেন, তবে কিন্তু বিয়ে করতে পাবে না।'

রাজার বাড়ির লোকেরা বর দেখে কী যে খুশি হল, কী বলব! তারা খালি এইজন্য দুঃখ করতে লাগল যে, এমন সুন্দর বর কিন্তু সে কথা কয় না কেন?

শিয়াল বলল, 'ওঁর মা মরে গিয়েছেন, সেই দুঃখে উনি কথা বলছেন না।' শুনে সবাই বলল, 'আহা!' কিন্তু আসল কথা এই যে, কথা বললেই কিনা জোলা ধরা পড়ে যাবে, তাই শিয়াল তাকে মানা করেছে।

খাবার সময় জোলাকে সোনার থালায় ভাত, আর একশোটা সোনার বাটিতে করে নানারকম তরকারি আর মিঠাই দিয়েছিল। সে এক-একটা করে সবগুলো বাটি হাতে নিয়ে শুঁকে দেখল। শেষে তার কোনোটাই চিনতে না পেরে, মিঠাই, ঝোল, অম্বল, সব একসঙ্গে ভাতের উপর ঢেলে মেখে নিল। তারপর তার খানিকটা বই খেতে না পেরে, যা বাকি ছিল চাদরে বাঁধতে গেল।

সকলে শিয়ালকে বলল, 'তোমাদের রাজা কেন এমন? কখনো-কিছু খায় নি নাকি?'

শিয়াল চোখ ঠেরে তাদের কানে কানে বলল, 'উনি একবার বই দুবার মেখে খান না, আর পাতে যা থাকে তা চাদরে বেঁধে সেই চাদরখানি-সুদ্ধ গরিবকে দেন। একজন গরিবকে ডাকো।'

বলে সে খাবার-বাঁধা চাদরখানি জোলার গা থেকে খুলে গরিবকে দিতে দিল।

শোবার সময় জোলার ভারি মুশকিল হল। হাতির দাঁতের খাটে বিছানা, তাতে মশারি খাটানো। সে বেচারা কোনোদিন খাটও দেখে নি, মশারিও দেখে নি।

সবসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে ধপাৎ

আগে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল, সেখানে বিছানা নেই দেখে বেরিয়ে এল। তারপর মশারির চারধার খুঁজে, তার দরজা টের না পেয়ে বলল, 'বুঝেছি, ঘরের ভিতর ঘর করেছে, তার দোর রেখেছে চালের উপর!'

বলে সে খাটের খুঁটি বেয়ে যেই মশারির চালে উঠতে গিয়েছে অমনি সবসুদ্ধ ভেঙে নিয়ে ধপাৎ! তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলল—

'ধান কাটতুম কাপড় বুনতুম
সেই ছিল ভালো।
রাজার মেয়ে বিয়ে করে মোর
কোমর ভেঙে গেল।'

ভাগ্যিস সেখানে আর লোক ছিল না, কেবল রাজার মেয়ে ছিলেন আর বাইরে শিয়াল বসে ছিল। রাজার মেয়ে অনেক কাঁদলেন, আর শিয়ালকে বকলেন। কিন্তু তাঁর ভারি বুদ্ধি ছিল, তাই একথা আর কাউকে বললেন না।

পরদিন রাজার মেয়ের কথায় শিয়াল গিয়ে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, আপনার জামাই বলছেন আপনার মেয়েকে নিয়ে তিনি নানান দেশ দেখতে যাবেন। তাই ছুটি চাচ্ছেন।'

রাজা খুশি হয়ে ছুটি দিলেন, আর লোকজন টাকাকড়ি সঙ্গে দিলেন। তারপর রাজার মেয়ে জোলাকে নিয়ে আর-এক দেশে গিয়ে বড়-বড় মাস্টার রেখে তাকে সকল রকম বিদ্যে শেখাতে লাগলেন। দু-তিন বছরের মধ্যে জোলা মস্ত পণ্ডিত আর বীর হয়ে উঠল।

তখন খবর এল রাজা মরে গেছেন, আর তাঁর ছেলে নেই বলে জামাইকে রাজা করে গিয়েছেন।

তখন খুব সুখের কথা হল।

কুঁজো বুড়ির কথা

এক–যে ছিল কুঁজো বুড়ি। সে লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলত, আর তার মাথাটা খালি ঠকঠক করে নড়ত। বুড়ির দুটো কুকুর ছিল। একটার নাম রঙ্গা, আর একটার নাম ভঙ্গা।

বুড়ি যাবে নাতনির বাড়ি, তাই কুকুর দুটোকে বলল, 'তোরা যেন বাড়ি থাকিস, কোথাও চলে–টলে যাসনে।'

রঙ্গা–ভঙ্গা বলল, 'আচ্ছা।' তারপর বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা খালি ঠকঠক করে নড়ছে। এমনি করে সে খানিক দূর গেল।

তখন এক শিয়াল তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঐ রে, সেই কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে! বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বলল, 'রোস, আমি আগে নাতনির বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শুনে শিয়াল বলল, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।' বলে শিয়াল চলে গেল।

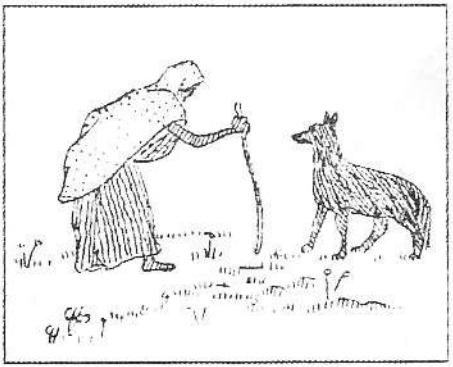

শিয়াল বলছে, 'বুড়ি, তোকে তো খাব!'

তারপর বুড়ি আবার লাঠি ভর দিয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা ঠকঠক করে নড়ছে। এমনি করে সে আরো খানিক দূর গেল।

তখন এক বাঘ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঐ রে, কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে! বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বলল, 'রোস, আমি আগে নাতনির বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শুনে বাঘ বলল, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।' বলে বাঘ চলে গেল।

তারপর বুড়ি আবার লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে, আর তার মাথাটা ঠকঠক করে নড়ছে। এমনি করে সে আরও খানিক দূর গেল।

তখন এক ভাল্লুক তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঐ রে, সেই কুঁজো বুড়ি যাচ্ছে! বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বলল, 'রোস, আমি আগে নাতনির বাড়ি থেকে মোটা হয়ে আসি, তারপর খাস। এখন খেলে তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি, আমার গায়ে কি আর কিছু আছে?'

শুনে ভাল্লুক বলল, 'আচ্ছা, তবে মোটা হয়ে আয়, তারপর খাব এখন।'

এই বলে ভাল্লুক চলে গেল। বুড়িও আর খানিক দূর গিয়েই তার নাতনির বাড়ি পৌঁছল। সেখানে দই আর ক্ষীর খেয়ে–খেয়ে সে এমনি মোটা হল যে কী বলব! আর একটু মোটা হলেই সে ফেটে যেত!

তাই সে তার নাতনিকে বলল, 'ওগো নাতনি, আমি তো বাড়ি চললুম। এবারে আমি চলতে পারব না। আমাকে গড়িয়ে যেতে হবে। আবার পথে ভাল্লুক, বাঘ আর শিয়াল হাঁ করে বসে আছে। আমাকে দেখতে পেলেই ধরে খাবে। এখন বল্ দেখি কী করি!'

নাতনি বলল, 'ভয় কী দিদিমা? তোমাকে এই লাউয়ের খোলাটার ভিতরে পুরে দেব। তাহলে বাঘ ভাল্লুক বুঝতেও পারবে না, তোমাকে খেতেও পারবে না।'

বলে, সে বুড়িকে একটা লাউয়ের খোলার ভিতর পুরে, তার খাবার জন্যে চিঁড়ে আর তেঁতুল সঙ্গে দিয়ে, 'হেঁইয়ো' বলে লাউয়ে ধাক্কা দিল, আর লাউ গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

'লাউ গড়গড়, লাউ গড়গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বিচি ফেলি টুলটুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!'

পথের মাঝখানে সেই ভাল্লুক হাঁ করে বসে আছে, বুড়িকে খাবে বলে। সে বুড়ি-টুড়ি কিছু দেখতে পেল না, খালি দেখলে একটা লাউ গড়িয়ে যাচ্ছে। লাউটাকে নেড়েচেড়ে দেখল বুড়িও নয়, খাবার জিনিসও নয়। আর তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে, 'বুড়ি গেল ঢের দূর!' শুনে সে ভাবল, বুড়ি চলে গিয়েছে। তখন সে ঘোঁৎ করে তাতে দিল এক ধাক্কা, আর সেটা গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

'লাউ গড়গড়, লাউ গড়গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বিচি ফেলি টুলটুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!'

আবার খানিক দূরে বাঘ বসে আছে বুড়িকে খাবে বলে। সে বুড়িকে দেখতে পেল না, খালি দেখল একটা লাউ গড়িয়ে যাচ্ছে। সেটাকে নেড়েচেড়ে দেখল বুড়িও নয়, খাবার জিনিসও নয়। আর তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে, 'বুড়ি গেল ঢের দূর!' শুনে সে ভাবল, বুড়ি চলে গিয়েছে। তখন সে ঘোঁৎ করে তাতে দিল এক ধাক্কা, আর সেটা গাড়ির মতন গড়গড়িয়ে চলল।

লাউ চলছে আর বুড়ি তার ভিতর থেকে বলছে—

'লাউ গড়গড়, লাউ গড়গড়,
খাই চিঁড়ে আর তেঁতুল,
বিচি ফেলি টুলটুল্।
বুড়ি গেল ঢের দূর!'

আবার খানিক দূরে সেই শিয়াল পথের মাঝখানে বসে আছে। সে লাউ দেখেই বলল, 'হুঁ! লাউ কিনা আবার কথা বলে! ওর ভিতরে কী আছে দেখতে হবে!' তখন সে হতভাগা লাথি মেরে লাউটা ভেঙেই বলে কিনা, 'বুড়ি, তোকে তো খাব!'

বুড়ি বলল, 'খাবি বৈকি! নইলে এসেছি কী করতে? তা, আগে দুটো গান শুনবি নে?'

শিয়াল বলল, 'হ্যাঁ, দুটো গান হলে মন্দ হয় না। আমিও একটু-আধটু গাইতে পারি।'

বুড়ি বলল, 'তবে ভালোই হল। চল্ ঐ টিপিটায় উঠে গাইব এখন।'

বলে বুড়ি সেই টিপির উপরে উঠে সুর ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'আয়, আয়, রঙ্গা-ভঙ্গা, তু-উ-উ-উ-উ!'

অমনি বুড়ির দুই কুকুর ছুটে এসে, একটায় ধরল শিয়ালের ঘাড়, আর-একটায় ধরল তার কোমর। ধরে টান—কী টান! শিয়ালের ঘাড় ভেঙে গেল, কোমর ভেঙে গেল, জিভ বেরিয়ে গেল, প্রাণ বেরিয়ে গেল—তবু তারা টানছেই, টানছেই, খালি টানছে।

উকুনে-বুড়ির কথা

এক-যে ছিল উকুনে-বুড়ি, তার মাথায় বড্ড ভয়ানক উকুন ছিল। সে যখন তার বুড়োকে ভাত খেতে দিতে যেত তখন ঝরঝর করে সেই উকুন বুড়োর পাতে পড়ত। তাইতে সে একদিন রেগে গিয়ে, ঠাই করে বুড়িকে ঠেঙার বাড়ি মারল। তখন বুড়ি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে গুঁড়ো করে রাগের ভরে সেই-যে নদীর ধার দিয়ে চলে গেল, আর তাকে বুড়ো ডেকে ফেরাতে পারল না।

নদীর ধারে এক বক বসে ছিল, সে উকুনে-বুড়িকে দেখে বলল, 'উকুনে-বুড়ি, কোথায় যাস?'

উকুনে-বুড়ি বলল—

'স্বামী মারলে, রাগে তাই
ঘর-গেরস্তি ফেলে যাই।'

বক বলল, 'তোর স্বামী মারলে কেন? কী হয়েছিল?'

উকুনে-বুড়ি বলল, 'আমার মাথা থেকে তার পাতে উকুন পড়েছিল।'

বক বলল, 'কেন, উকুন তো বেশ লাগে! তার জন্যে মারলে কেন? তুই আমার বাড়ি চল্। শুনেছি তুই খুব ভালো রাঁধিস।'

তাইতে উকুনে-বুড়ি বকের রাঁধুনি হল। তার রান্না বকের বেশ ভালো লাগত, আর পাতে উকুন পড়লে তো সে খুব খুশিই হত।

তখন, একদিন হয়েছে কী—বক এনেছে একটা মস্ত শোলমাছ। এনে সে উকুনে-বুড়িকে বলল, 'উকুনে-বুড়ি, মাছটা বেশ করে রাঁধ।'

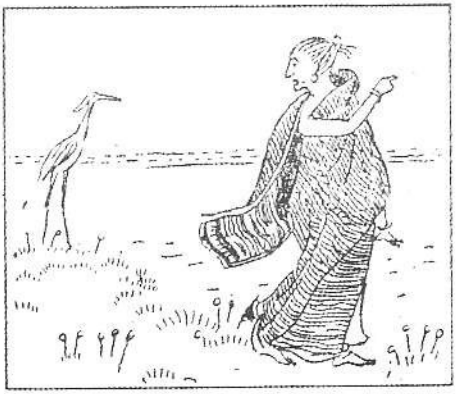

উকুনে-বুড়ি ও বক

বলে সে আবার নদীর ধারে চলে গেল। উকুনে-বুড়ি মাছ রাঁধতে লাগল। রাঁধতে-রাঁধতে বেচারা মাথা ঘুরে কখন কড়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছে কেউ জানতে পারে নি।

বক এসে দেখল, উকুনে-বুড়ি পুড়ে মরে আছে। দেখে তার এমনি দুঃখ হল যে, সে নদীর ধারে গিয়ে মুখ ভার করে বসে রইল, সাতদিন কিছু খেল না।

নদী বলল, 'ভালো রে ভালো, সাতদিন ধরে এমন করে বসে আছে, খায়-দায় নি! এর হল কী? হ্যাঁ ভাই, বক, তোর কী হয়েছে ভাই?'

বক বলল, 'আরে ভাই, সে-কথা বলে কী হবে? আমার যা হবার তা হয়েছে।'

নদী বলল, 'ভাই, আমাকে বলতে হবে।'

বক বলল, 'যদি বলি তবে কিন্তু তোর সব জল ফেনা হয়ে যাবে।'

নদী বলল, 'হয় হবে তুই বল্।'

তখন বক বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল।'

অমনি ফ্যান-ফ্যান করে দেখতে-দেখতে নদীর জল ফেনিয়ে শাদা হয়ে গেল।

সেই নদীতে এক হাতি রোজ জল খেতে আসে। সেদিন সে জল খেতে এসে দেখে, এ কী কাণ্ড হয়ে আছে!

হাতি বলল, 'নদী, তোর এ কী হল! তোর জল কী করে ফেনা হয়ে গেল?'

নদী বলল, 'তা যদি বলি তবে কিন্তু তোর লেজটি খসে পড়ে যাবে।'

হাতি বলল, 'যায় যাবে তুই বল্।' তখন নদী বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল।'

অমনি ধপাস করে হাতির লেজটা খসে পড়ে গেল।

তারপর হাতি গাছতলা দিয়ে যাচ্ছে, গাছ তাকে দেখে বলল, 'বাহ্ রে, তোর এ কী হল? তোর লেজ কোথায় গেল?'

হাতি বলল, 'তা যদি বলি তবে কিন্তু তোর পাতাগুলি সব এক্ষুনি ঝরে পড়বে।'

গাছ বলল, 'পড়ে পড়ুক তুই বল্।' তখন হাতি বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল।'

অমনি ঝরঝর করে গাছের সবগুলি পাতা ঝরে পড়ে গেল। সেই গাছে এক ঘুঘুর বাসা ছিল। সে তখন খাবার খুঁজতে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে, ওমা, এ কী হয়েছে! ঘুঘু বলল, 'গাছ, তোর এ কী হল? তোর পাতা কোথায় গেল?'

গাছ বলল, 'তা যদি বলি তবে কিন্তু তোর চোখ কানা হয়ে যাবে।'

ঘুঘু বলল, 'যায় যাবে তুই বল্।' গাছ তখন বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,

হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল।'

অমনি টস করে ঘুঘুপাখির একটা চোখ কানা হয়ে গেল।

কানা চোখ নিয়ে ঘুঘু মাঠে চরতে গিয়েছে, তখন রাজার বাড়ির রাখাল তাকে দেখে বলল, 'সে কী রে ঘুঘু, তোর চোখ কী হল?'

ঘুঘু বলল, 'তা যদি বলি তবে কিন্তু তোমার হাতে তোমার লাঠিটা আটকে যাবে।'

রাখাল বলল, 'যায় যাবে তুই বল্।' তখন ঘুঘু বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল।'

অমনি চটাস করে রাখালের লাঠি তার হাতে আটকে গেল। সে কত হাত ঝাড়ল, কিছুতেই তাকে ফেলতে পারল না। যখন গরু নিয়ে সে রাজার বাড়িতে ফিরে এসেছে তখনো সে হাত ঝাড়ছে।

রাজার বাড়ির দাসী ভাঙা-কুলোয় করে ছাই ফেলতে যাচ্ছিল। সে রাখালকে দেখে বলল, 'দূর হতভাগা! অমনি করে হাত ঝাড়ছিস কেন? কী হয়েছে তোর হাতে?'

রাখাল বলল, 'সে-কথা যদি বলি তবে কিন্তু আর ঐ কুলোখানি তোমার হাত থেকে নামাতে পারবে না, সেখানি তোমার হাতেই আটকে থাকবে।'

দাসী বলল, 'ইশ্! আচ্ছা থাকে থাকবে, তুই বল্।' তখন রাখাল বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল।'

অমনি দাসী 'ওমা! এ কী গো! কী হবে গো!' বলে কাঁদতে লাগল। সে অনেক করেও কুলো হাত থেকে নামাতে পারল না।

শেষে রাখাল ছোকরাকে গাল দিতে দিতে ঘরে গেল।

ঘরে গিয়ে দাসী হাত থেকে আর কুলো নামাচ্ছে না। রানি তখন থালা হাতে করে রাজার জন্যে ভাত বাড়ছিলেন। দাসীকে দেখে তিনি হেসে বললেন, 'দাসী, তোর হয়েছে কী? কুলোটা হাত থেকে নামাচ্ছিস নে কেন?'

দাসী বলল, 'তা যদি বলি রানিমা, তবে কিন্তু ঐ থালাখানা আর আপনার হাত থেকে নামাতে পারবেন না, ওখানা আপনার হাতে আটকে যাবে।'

রানি বললেন, 'বটে! আচ্ছা বল্ দেখি কেমন আটকায়!'

তখন দাসী বলল—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল।'

অমনি রানির হাতে থালাখানি আটকে গেল, কিছুতেই তিনি আর তা নামাতে পারলেন না। তখন আর কী করেন? আর একখানা থালায় করে রাজামশাইর জন্যে ভাত বেড়ে নিয়ে চললেন।

রাজামশাই তাঁকে দেখেই বললেন, 'রানি, ঐ থালাখানা হাতে করে রেখেছ যে?'

রানি বললেন, 'তা যদি বলি তবে কিন্তু আর তুমি এখান থেকে উঠে যেতে পারবে না, তুমি ঐ পিঁড়িতে আটকে থাকবে।'

শুনে রাজা তো হো-হো করে হাসলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা তাই হোক, তুমি বল।' তখন রানি বললেন—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রানির হাতে থালা আটকাল।'

বলতে-বলতেই তো রাজামশাই পিঁড়িতে খুব ভালোমতোই আটকে গেলেন। কত টানাটানি করলেন, কিছুতেই উঠতে পারলেন না। চাকরদের ডাকলেন, তারাও কিছু করতে পারল না। তখন সেই পিঁড়ি-সুদ্ধ তাঁকে চারজনে ধরাধরি করে এনে সভায় বসিয়ে দিল।

তা দেখে সভার লোকদের তো ভারি মুশকিলই হল। তাদের ভয়ানক হাসি পাচ্ছে। তারা হাসি থামাতে পারছে না, হাসতেও পারছে না, পাছে রাজামশাই রাগ করেন। কেউ ভয়ে জিগগেস করতেও পারছে না রাজামশাইয়ের কী হয়েছে।

তখন রাজামশাই নিজেই বললেন, 'তোমরা বুঝি জানতে চাচ্ছ, আমি পিঁড়িতে কী করে আটকে গেলাম?'

তারা হাত জোড় করে বলল, 'হ্যাঁ মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'তা যদি বলি, তবে তোমরাও যে-যার বসবার জায়গায় আটকে যাবে।'

তারা বলল, 'মহারাজ যদি আটকালেন, তবে আমরা আর বাকি থাকি কেন?' তখন রাজা বললেন—

'উকুনে-বুড়ি পুড়ে মোলো,
বক সাতদিন উপোস রইল,
নদীর জল ফেনিয়ে গেল,
হাতির লেজ খসে পড়ল,
গাছের পাতা ঝরে পড়ল,
ঘুঘুর চোখ কানা হল,
রাখালের হাতে লাঠি আটকাল,
দাসীর হাতে কুলো আটকাল,
রানির হাতে থালা আটকাল,
পিঁড়িতে রাজা আটকাল।'

বলতেই আর তারা যাবে কোথায়! এমনি করে তারা তক্তপোশে আটকে গেল যে, আর তাদের উঠবার সাধ্য নেই।

পিঁড়িতে রাজা আটকাল

ভাগ্যিস সেই দেশে এক খুব বুদ্ধিমান নাপিত ছিল, নইলে মুশকিল হয়েছিল আর কী। নাপিত এসে বলল, 'শিগগির ছুতোর ডাকো।'

তখন ছুতোর এসে পিঁড়ি কেটে রাজামশাইকে ছাড়ালে, আর তক্তপোশ কেটে সভার লোকদের ছাড়ালে। একটু একটু কাঠ তবু সকলের গায়ে লেগে ছিল, সেটুকু চেঁচে তুলে দিল।

রানির হাতের থালা, দাসীর হাতের কুলো আর রাখালের হাতের লাঠিও কেটে ফেলে দেওয়া হল।

পান্তাবুড়ির কথা

এক–যে ছিল পান্তাবুড়ি, সে পান্তাভাত খেতে বড্ড ভালোবাসত।

এক চোর এসে রোজ পান্তাবুড়ির পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে রাজার কাছে নালিশ করতে চলল।

পান্তাবুড়ি পুকুরধার দিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিঙিমাছ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বলল, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

শিঙিমাছ বলল, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর পান্তাবুড়ি বেলতলা দিয়ে যাচ্ছে। একটা বেল মাটিতে পড়ে ছিল, সে বলল, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বলল, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

বেল বলল, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বলল, 'আচ্ছা।'

পান্তাবুড়ি

তারপর পান্তাবুড়ি পথের ধারে খানিকটা গোবর দেখতে পেল। গোবর বলল, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বলল, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

গোবর বলল, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর খানিক দূর গিয়ে পান্তাবুড়ি দেখল, পথের ধারে একখানা ক্ষুর পড়ে রয়েছে।

ক্ষুর বলল, 'পান্তাবুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?'

পান্তাবুড়ি বলল, 'চোরে আমার পান্তাভাত খেয়ে যায়, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।'

ক্ষুর বলল, 'ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিও, তোমার ভালো হবে।'

পান্তাবুড়ি বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর পান্তাবুড়ি রাজার বাড়ি গিয়ে দেখল, রাজামশাই বাড়ি নেই। কাজেই সে আর নালিশ করতে পেল না।

বাড়ি ফিরবার সময় তার ক্ষুর আর গোবর আর বেল আর শিঙি মাছের কথা মনে হল। সে তাদের সকলকে তার থলেয় করে নিয়ে এল।

পান্তাবুড়ি যখন বাড়ির আঙিনায় এসেছে, তখন ক্ষুর তাকে বলল, 'আমাকে ঘাসের উপর রেখে দাও।'

তাই বুড়ি ক্ষুরখানাকে ঘাসের উপর রেখে দিল।

তারপর যখন সে ঘরে উঠতে যাচ্ছে, তখন গোবর বলল, 'আমাকে পিঁড়ির উপর রেখে দাও।'

তাই বুড়ি গোবরটাকে পিঁড়ির উপর রেখে দিল।

বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল তখন বেল বলল, 'আমাকে উনুনের ভিতর রাখ।' শুনে বুড়ি তাই করল।

শেষে শিঙিমাছ বলল, 'আমাকে তোমার পান্তাভাতের ভিতরে রাখ।' বুড়িও তাই করল।

তারপর রাত হলে বুড়ি রান্না-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে রইল।

ঢের রাত্রে চোর এসেছে। সে তো আর জানে না, সেদিন বুড়ি কী ফন্দি করেছে! সে এসেই পান্তাভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিল। সেখানে ছিল শিঙিমাছ। সে চোরের বাছাকে এমনি কাঁটা ফুটিয়ে দিল যে, তার দুইচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

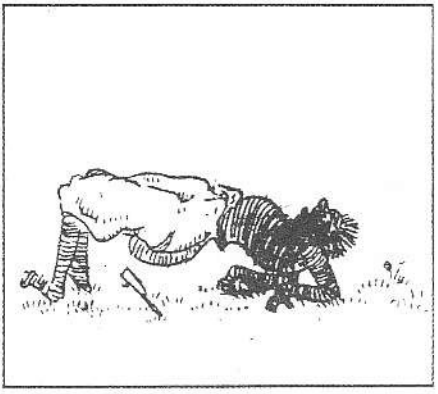

'ও, মাগো গেলুম গো!'

শিঙিমাছের খোঁচা খেয়ে চোর কাঁদতে কাঁদতে উনুনের কাছে গেল। ভিতরে ছিল বেল। চোর যেই আঙুলে তাপ দেবার জন্য উনুনে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি পটাশ করে বেল ফেটে তার চোখেমুখে ভয়ানক লাগল।

তখন সে ব্যথা আর ভয়ে পাগলের মতো হয়ে, যেই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে অমনি সেই গোবরে তার পা পড়েছে। তাতে সে পা হড়কে ধপাস করে সেই গোবরের উপরেই বসে পড়ল।

তারপর গোবর লেগে ভূত হয়ে বেটা গিয়েছে ঘাসে পা মুছতে। সেইখানে ছিল ক্ষুর, তাতে ভয়ানক কেটে গেল। তাতে আর 'ও মাগো! গেলুম গো!' বলে না চেঁচিয়ে বাছা যান কোথায়?

তা শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসে বলল, 'এই ব্যাটা চোর। ধর বেটাকে! মার বেটাকে! কান ছিঁড়ে ফেল!'

তখন যে চোরের সাজাটা!

চড়াই আর কাকের কথা

কাক আর চড়াইপাখিতে খুব ভাব ছিল।

গৃহস্থদের উঠানে চাটাই ফেলে ধান আর লঙ্কা রোদে দিয়েছে। চড়াই তা দেখে কাককে বলল,

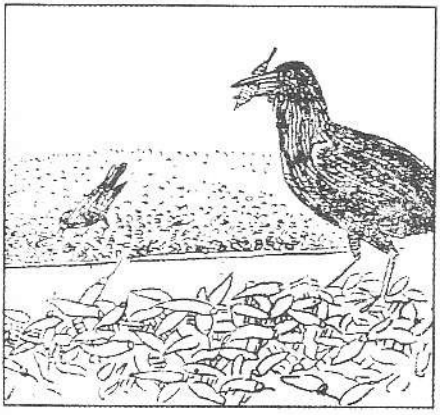

দুজনে ধান আর লঙ্কা খেতে লাগল

'বন্ধু, তুমি আগে লঙ্কা খেয়ে শেষ করতে পারবে, না আমি আগে ধান খেয়ে শেষ করতে পারব?'

কাক বলল, 'আমি লঙ্কা আগে খাব।'

চড়াই বলল, 'না, আমি ধান আগে খাব।'

কাক বলল, 'যদি না খেতে পার তবে কী হবে?'

চড়াই বলল, 'যদি না খেতে পারি, তবে তুমি আমার বুক খুঁড়ে খাবে। আর যদি তুমি না খেতে পার, তবে কী হবে?'

কাক বলল, 'তুমি আমার বুক খুঁড়ে খাবে।'

এই বলে তো দুজনে ধান আর লঙ্কা খেতে লাগল। চড়াই কুটকুট করে এক-একটি ধান খায়, আর কাক খপখপ করে একটি একটি লঙ্কা খায়। দেখতে দেখতে কাক সব লঙ্কা খেয়ে শেষ করল, চড়াইয়ের তখন ধানের সিকিও খাওয়া হয় নি।

তখন কাক বলল, 'কী বন্ধু, এখন?'

চড়াই বলল, 'এখন আর কী হবে! বন্ধু হয়ে যদি আমার বুক খেতে চাও, তবে খাবে। তবে ঠোঁটদুটো ধুয়ে নিয়ো, তুমি নোংরা জিনিস খাও।'

কাক বলল, 'আমি ঠোঁট ধুয়ে আসছি।' বলে সে গঙ্গায় ঠোঁট ধুতে গেল।

তখন গঙ্গা তাকে বললেন, 'তোর নোংরা ঠোঁট আমার গায়ে ছোঁয়াসনে! জল তুলে নিয়ে ঠোঁট ধো।'

তাতে কাক বলল, 'আচ্ছা, আমি ঘটি নিয়ে আসছি।' বলে সে কুমোরের কাছে গিয়ে বলল—

'কুমোর, কুমোর! দে তো ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

কুমোর বলল, 'ঘটি তো নেই! মাটি আন্, গড়ে দি।' শুনে কাক মোষের কাছে তার শিং চাইতে গেল, সেই শিং দিয়ে মাটি খুঁড়বে। কাক বলল—

'মোষ, মোষ! দে তো শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

শুনে মোষ রেগে তাকে এমনি গুঁতোতে এল যে সে সেখান থেকে দে-ছুট! তারপর সে কুকুরের কাছে গিয়ে বলল—

কুত্তা, কুত্তা! মারবি মোষ,
লব শিং, খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

কুকুর বলল, 'আগে দুধ আন্, খেয়ে গায়ে জোর করি, তবে মোষ মারব এখন!' শুনে কাক গাইয়ের কাছে গিয়ে বলল—

'গাই, গাই! দে তো দুধ,
খাবে কুত্তা, হবে তাজা,
মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

গাই বলল, 'ঘাস আন্ খাই, তার পর দুধ দেব।'

শুনে কাক মাঠের কাছে গিয়ে বলল—

'মাঠ, মাঠ! দে তো ঘাস,
খাবে গাই, দেবে দুধ,

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

খাবে কুত্তা, হবে তাজা,
মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

মাঠ বলল, 'ঘাস তো রয়েছে, নিয়ে যা না।'

তখন কাক কামারের বাড়ি গিয়ে বলল—

'কামার, কামার! দে তোর কাস্তে,
কাটব ঘাস, খাবে গাই,
দেবে দুধ, খাবে কুত্তা,
হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

কামার বলল, 'আগুন নেই। আগুন নিয়ে আয়, কাস্তে গড়ে দি।' তা শুনে কাক গৃহস্থদের বাড়ি গিয়ে বলল—

'গেরস্থ ভাই, দাও তো আগুন,
গড়বে কাস্তে, কাটব ঘাস,
খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা,
হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং,
খুঁড়ব মাটি, গড়বে ঘটি,
তুলব জল, ধোব ঠোঁট—
তবে খাব চড়াইর বুক।'

তখন গৃহস্থ এক হাঁড়ি আগুন এনে বলল, 'কিসে করে নিবি?'

বোকা কাক তার পাখা ছড়িয়ে বলল, 'এই আমার পাখার উপরে ঢেলে দাও।'

গৃহস্থ সেই হাঁড়িসুদ্ধ আগুন কাকের পাখার উপর ঢেলে দিল, আর সে-বেটা তখুনি পুড়ে মরে গেল। তার আর চড়াইর বুক খাওয়া হল না।

চড়াই আর বাঘের কথা

গৃহস্থের ঘরের কোণে হাঁড়ি ঝোলানো ছিল, তার ভিতরে চড়াই-চড়নী থাকত।

একদিন চড়াই বলল, 'চড়নী, আমি পিঠে খাব।'

চড়নী বলল, 'পিঠের জিনিসপত্র এনে দাও, পিঠে গড়ে দেব এখন।'

চড়াই বলল, 'কী জিনিস লাগবে?'

চড়নী বলল, 'ময়দা লাগবে, গুড় লাগবে, কলা লাগবে, দুধ লাগবে, কাঠ লাগবে।'

চড়াই বলল, 'আচ্ছা আমি সব এনে দিচ্ছি।'

বলে সে বনের ভিতর গিয়ে, গাছের সরু-সরু শুকনো ডাল মটমট করে ভাঙতে লাগল।

সেই বনের ভিতর এক মস্ত বাঘ ছিল, সে চড়াইকে বলত 'বন্ধু'। ডাল-ভাঙার শব্দ শুনে সে বলল, 'মটমট করে ডাল ভাঙছ, ও কি আমার বন্ধু?'

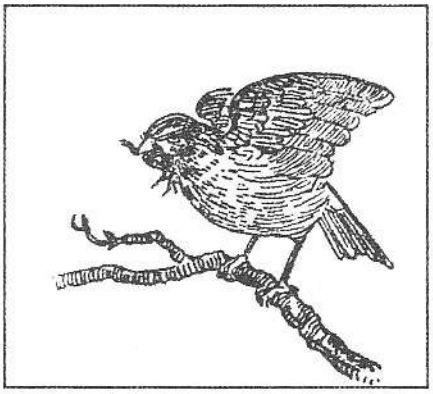

চড়াই ডাল ভাঙছে

চড়াই বলল, 'হ্যাঁ, বন্ধু।'

বাঘ বলল, 'ডাল দিয়ে কী হবে?'

চড়াই বলল, 'কাঠ চাই, চড়নী পিঠে গড়বেন।'

শুনে বাঘ বলল, 'বন্ধু, আমি কখখনো পিঠে খাই নি, আমাকে দিতে হবে।'

চড়াই বলল, 'তবে জোগাড় সব এনে দাও।'

বাঘ বলল, 'কী-কী জোগাড় চাই?'

চড়াই বলল, 'ময়দা চাই, গুড় চাই, কলা চাই, দুধ চাই, ঘি চাই, হাঁড়ি চাই, কাঠ চাই।'

বাঘ বলল, 'আচ্ছা, তুমি ঘরে যাও, আমি সব এনে দিচ্ছি।' চড়াই তখন ঘরে চলে এল, আর বাঘ দুলতে দুলতে বাজারে চলল। বাজারে গিয়ে বাঘ খালি একটিবার বলল, 'হাল্লুম!' অমনি দোকানিরা 'বাবা গো! বাঘ এসেছে! পালা, পালা!' বলে দোকানটোকান সব ফেলে ছুটে পালাল। তখন বাঘ সব দোকান খুঁজে ময়দা, গুড়, কলা, দুধ, ঘি, হাঁড়ি আর কাঠ নিয়ে চড়াইয়ের বাড়িতে দিয়ে এল।

তারপর চড়নী চমৎকার পিঠে গড়ল, আর দুজনে মিলে পেট ভরে খেল। শেষে বাঘের জন্য একখানা পাতায় করে কতকগুলি পিঠে মাটিতে রেখে দিয়ে, দুজনে চুপ করে হাঁড়ির ভিতরে বসে রইল।

বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়েই খেতে বসে গেল।

একখানা পিঠে মুখে দিয়ে সে বলল, 'বাহ্! কী চমৎকার!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বলল, 'না, এটা তত ভালো নয়, খালি ময়দা দিয়ে গড়েছে!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বলল, ছি! এটাতে খালি ভূষি আর ছাই! চড়াইবন্ধু, এ কী খাওয়ালে!'

আর একখানা মুখে দিয়ে বলল, 'উঁহুঁ! এটাতে কিসের গন্ধ! গোবর দিয়েছে নাকি? চড়াই বেটা তো বড় পাজি।'

এমন সময় হয়েছে কী! চড়াই হাঁড়ির ভিতর থেকে নাকমুখ সিঁটকিয়ে বলছে, 'চড়নী, আমি হাঁচব!'

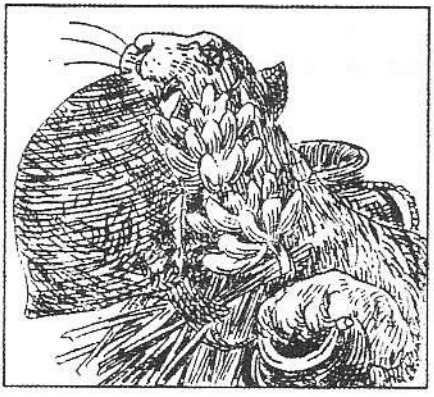

বাঘ পিঠে গড়বার জিনিস নিয়ে আসছে

শুনে চড়নী ভারি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চুপ, চুপ! এখন হাঁচতে হবে না, তাহলে বড় মুশকিল হবে।'

তাতে চড়াই চুপ করল। কিন্তু খানিকবাদেই আবার ভয়ানক নাকমুখ সিঁটকিয়ে হাঁচতে গেল। চড়নী তাকে থামাতে কত চেষ্টা করল, কিছুতেই থামিয়ে রাখতে পারল না।

বাঘ একটা বিশ্রী পিঠে খেয়ে বলল, 'থু! থু! এটা খালি গোবর দিয়েই গড়েছে, আর কিছু দেয় নি! যদি চড়াইয়ের নাগাল পাই, তাকে কামড়িয়ে চিবিয়ে খাব!'

তারপর আর একটা পিঠে মুখে নিয়ে সে সবে ওয়াক্-ওয়াক্ করতে লেগেছে, অমনি হ্যাঁ-চ্চোঃ করে চড়াই ভয়ানক শব্দে হেঁচে ফেলল। সে-শব্দে বাঘ যেই চমকে লাফিয়ে উঠতে যাবে, অমনি হাঁড়িসুদ্ধ দড়ি ছিঁড়ে, চড়াই আর চড়নী তার ঘাড়ে পড়ল।

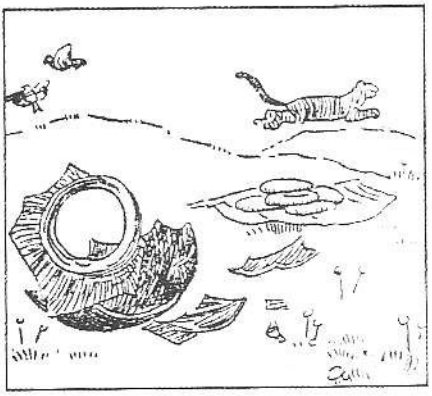

হাঁড়ি ভাঙার শব্দে বাঘ পালাচ্ছে

বাঘ কিছুই বুঝতে পারল না, কি বাজ পড়ল, না আকাশ ভেঙে পড়ল! সে খুব ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ছুট দিল, আর তার ঘরে না গিয়ে থামল না।

দুষ্ট বাঘ

রাজার বাড়ির সিংহ-দরজার পাশে, লোহার খাঁচায় একটা মস্ত বাঘ ছিল। রাজার বাড়ির সামনে দিয়ে যত লোক যাওয়া-আসা করত, বাঘ হাতজোড় করে তাদের সকলকেই বলত, 'একটিবার খাঁচার দরজাটা খুলে দাও না দাদা!' শুনে তারা বলত, 'তা বইকি! দরজাটি খুলে দি, আর আমাদের ঘাড় ভাঙো!'

ঠাকুরমশাই বাঘকে বোঝাচ্ছেন

এর মধ্যে একদিন রাজার বাড়িতে খুব নিমন্ত্রণের ধুম লেগেছে। বড়-বড় পণ্ডিতমশাইয়েরা দলেদলে নিমন্ত্রণ খেতে আসছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ঠাকুর দেখতে ভারি ভালোমানুষের মতো ছিলেন। বাঘ এই ঠাকুরমশাইকে বারবার প্রণাম করতে লাগল।

তা দেখে ঠাকুরমশাই বললেন, 'আহা, বাঘটি তো বড় লক্ষ্মী! তুমি কী চাও বাপু?'

বাঘ হাতজোড় করে বলল, 'আজ্ঞে একটিবার যদি এই খাঁচার দরজাটা খুলে দেন ! আপনার দুটি পায়ে পড়ি !'

ঠাকুরমশাই কিনা বড্ড ভালোমানুষ ছিলেন, তাই তিনি বাঘের কথায় তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

তখন হতভাগা বাঘ হাসতে-হাসতে বাইরে এসেই বলল, 'ঠাকুর, তোমাকে তো খাব !' আর কেউ হলে হয়তো ছুটে পালাত। কিন্তু এই ঠাকুরটি ছুটতে জানতেন না। তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এমন কথা তো কখনো শুনি নি ! আমি তোমার এত উপকার করলাম, আর তুমি বলছ কিনা আমাকে খাবে ! এমন কাজ কি কেউ কখনো করে ?'

বাঘ বলল, 'করে বইকি ঠাকুর, সকলেই তো করে থাকে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'তা কখনোই নয়। চল দেখি তিনজন সাক্ষীকে জিগগেস করি, তারা কী বলে।'

বাঘ বলল, 'আচ্ছা চলুন। আপনি যা বলছেন সাক্ষীরা যদি তাই বলে, তবে আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আর যদি তারা আমার কথা ঠিক বলে, তবে আপনাকে ধরে খাব।'

সাক্ষী খুঁজতে দুজনে মাঠে গেলেন। দুই ক্ষেতের মাঝখানে খানিকটা মাটি উঁচু রেখে চাষিরা একটি ছোট পথের মতন করে দেয়, তাকে আল বলে। ঠাকুরমশাই সেই আল দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার একজন সাক্ষী।'

বাঘ বলল, 'আচ্ছা, ওকে জিগগেস করুন, ও কী বলে।'

ঠাকুরমশাই তখন জিগগেস করলেন, 'ওহে বাপু আল, তুমি বল দেখি, আমি যদি কারো ভালো করি, সে কি উল্টো আমার মন্দ করে ?'

আল বলল, 'করে বইকি ঠাকুর ! এই আমাকে দিয়েই দেখুন না। দুই চাষার ক্ষেতের মাঝখানে আমি থাকি, তাতে তাদের কত উপকার হয়। একজনের জমি আর একজন নিয়ে যেতে পারে না, একজনের ক্ষেতের জল আর একজনের ক্ষেতে চলে যায় না। আমি তাদের এত উপকার করি, তবু হতভাগারা লাঙল দিয়ে আমাকেই কেটে তাদের ক্ষেত বাড়িয়ে নেয় !'

বাঘ বলল, 'শুনলেন তো ঠাকুরমশাই, ভালো করলে তার মন্দ কেউ করে কিনা !'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'রোস, আমার তো আরো দুজন সাক্ষী আছে।'

বাঘ বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছ ছিল। ঠাকুরমশাই তাকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আমার আর একজন সাক্ষী।'

বাঘ বলল, 'আচ্ছা, ওকে জিগগেস করুন। দেখি ও কী বলে।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাপু বটগাছ, তোমার তো অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক দেখেছ শুনেছ। বল দেখি, উপকার যে করে তার অনিষ্ট কি কেউ করে ?'

বটগাছ বলল, 'তাই তো লোক আগে করে। ঐ লোকগুলো আমার ছায়ায় বসে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর আমাকেই খুঁচিয়ে আমার আঠা বার করেছে। সেই আঠা রাখবার জন্যে আমারই পাতা ছিঁড়েছে। তারপর ঐ দেখুন, আমার ডালটা ভেঙে নিয়ে চলেছে।'

বাঘ বলল, 'কি ঠাকুরমশাই, ও কী বলছে !'

তখন ঠাকুরমশাই তো মুশকিলে পড়লেন। আর কী বলবেন ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। এমন সময় সেখান দিয়ে একটা শিয়াল যাচ্ছিল। ঠাকুরমশাই সেই শিয়ালকে দেখিয়ে বললেন,

'ঐ আমার আর একজন সাক্ষী। দেখি ও কী বলে।'

তারপর তিনি শিয়ালকে ডেকে বললেন, 'শিয়াল পণ্ডিত, একটু দাঁড়াও। তুমি আমার সাক্ষী।'

শিয়াল দাঁড়াল, কিন্তু কাছে আসতে রাজি হল না। সে দূর থেকেই জিগগেস করল, 'সে কী কথা! আমি কী করে আপনার সাক্ষী হলুম?'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বল দেখি বাপু, যে ভালো করে তার মন্দ কি কেউ করে?'

শিয়াল বলল, 'কার কী ভালো কে করেছিল, আর কার কী মন্দ কে করেছে, শুনলে তবে বলতে পারি।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম—'

এই কথা শুনেই শিয়াল বলল, 'এটা বড় শক্ত কথা হল। সেই খাঁচা আর সেই পথ না দেখলে আমি কিছুতেই বলতে পারব না।'

কাজেই সকলকে আবার সেই খাঁচার কাছে আসতে হল।

তারপর শিয়াল অনেকক্ষণ সেই খাঁচার চারধারে পায়চারি করে বলল, 'আচ্ছা, খাঁচা আর পথ বুঝতে পেরেছি। এখন কী হয়েছিল বলুন।'

ঠাকুরমশাই বললেন, 'বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর আমি ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম।'

অমনি শিয়াল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান, অত তাড়াতাড়ি করবেন না; আগে ঐটুকু বেশ করে বুঝে নিই। কী বললেন? বাঘ আপনার বামুন ছিল, আর পথটা খাঁচার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল?'

এই কথা শুনে বাঘ হো-হো করে হেসে বলল, 'দূর গাধা! বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বলল, 'রোস দেখি—বামুন খাঁচার ভিতরে ছিল, আর বাঘ পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বলল, 'আরে বোকা, তা নয়! বাঘ খাঁচার ভিতরে ছিল, বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।'

শিয়াল বলল, 'এ তো ভারি গোলমালের কথা হল দেখছি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বললে? বাঘ বামুনের ভিতরে ছিল, আর খাঁচা পথ দিয়ে যাচ্ছিল?'

বাঘ বলল, 'এমন বোকা তো আর কোথাও দেখি নি! আরে বাঘ ছিল খাঁচার ভিতরে, আর বামুন যাচ্ছিল পথ দিয়ে।'

তখন শিয়াল মাথা চুলকাতে-চুলকাতে বলল, 'না! অত শক্ত কথা আমি বুঝতে পারব না!'

ততক্ষণে বাঘ রেগে গিয়েছে।

সে শিয়ালকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'ও কথা তোকে বুঝতেই হবে! দেখ, আমি এই খাঁচার ভিতরে ছিলুম—দেখ—এই এমনি করে—'

বলতে-বলতে বাঘ খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকল, আর শিয়ালও অমনি খাঁচার

শিয়াল খাঁচা বন্ধ করে দিচ্ছে

দরজা বন্ধ করে হুড়কো এঁটে দিল। তারপর শিয়াল ঠাকুরমশাইকে বলল, 'ঠাকুরমশাই, এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমার সাক্ষী যদি শুনতে চান, তবে তা হচ্ছে এই যে, দুষ্ট লোকের উপকার করতে নেই। কাজেই বাঘমামার জিত। এখন আপনি শিগগির যান, এখনো ফলার ফুরোয় নি।' বলে শিয়াল বনে চরতে গেল, আর ঠাকুরমশাই ফলার খেতে গেলেন।

বাঘ-বর

এক গরিব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ঘরে ব্রাহ্মণী ছিলেন, আর ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের খেতে দেবার জন্যে কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে ভিক্ষে করে যা আনতেন, এক বেলা ভালো করে না-খেতেই তা ফুরিয়ে যেত। সকল দিন আবার তা-ও মিলত না।

একদিন তাঁদের ছোট্ট মেয়েটি পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখল, সে বাড়িতে পায়েস রান্না হয়েছে, ছেলেরা পায়েস খাচ্ছে। দেখে সেই মেয়েটিরও বড্ড পায়েস খেতে ইচ্ছে হল। তাই সে বাড়ি এসে তার মাকে বলল, 'মা, আমাকে পায়েস করে দাও না, আমি পায়েস খাব!'

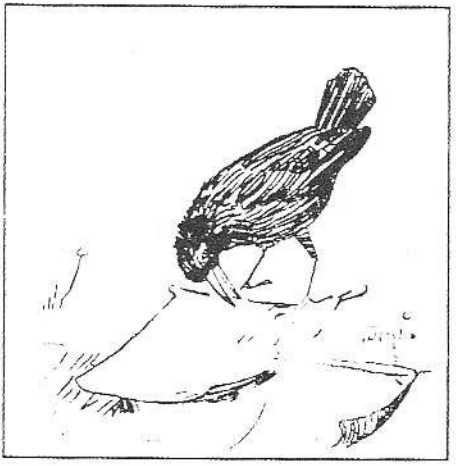

কাক কিছু খেতে পেল না

শুনে তো তার মা কাঁদতে লাগলেন। ভাতই ভালো করে খেতে পান না, পায়েস আবার কী করে করবেন?

এমন সময় ব্রাহ্মণ ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণী কাঁদছেন। দেখে তিনি জিগগেস করলেন, 'কাঁদছ কেন ব্রাহ্মণী, কী হয়েছে?'

ব্রাহ্মণী বললেন, 'মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, পায়েস কোত্থেকে দেব, তাই আমি কাঁদছি।'

শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, 'আচ্ছা, আমি দেখছি এর একটা কিছু করতে পারি কি-না, তুমি কেঁদো না।' বলে তিনি তখুনি আবার বেরিয়ে গেলেন।

সেই গ্রামে একজন খুব ভালো জমিদার ছিলেন।

তিনি যেই শুনলেন ব্রাহ্মণের মেয়ে পায়েস খেতে চেয়েছে, অমনি তাঁকে চমৎকার গোপালভোগ চাল, দু-সের দুধ, চিনি আর মশলা দিলেন।

ব্রাহ্মণ তাতে খুব খুশি হয়ে, জমিদারকে আশীর্বাদ করে, ছুটে বাড়ি এসে ব্রাহ্মণীকে বললেন, 'এই নাও, তোমার পায়েসের জোগাড় এনেছি।'

সেই ব্রাহ্মণী কী লক্ষ্মী মেয়েই ছিলেন! তিনি এমন সুন্দর রাঁধতেন যে, তেমন রান্না কেউ কখনো খায় নি। তিনি যখন পায়েস রাঁধতে লাগলেন, তখন তার চমৎকার গন্ধে আশেপাশে সকল লোক পাগল হয়ে উঠল।

একটা কাক সেই পায়েসের গন্ধ পেয়ে বলল, 'আহা ! এমন চমৎকার জিনিস একটু না-খেয়ে দেখলে চলছে না !'

বলেই সে ব্রাহ্মণের ঘরের চালে এসে বসল।

কাক অনেকক্ষণ ধরে ঘরের চালে চুপ করে বসে রইল। তারপর রান্নাঘরে একটু শব্দ হতেই সে বলল, 'ঐ ! এবারে রান্না হয়েছে !'

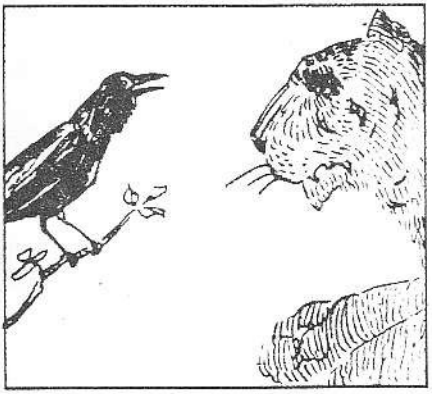

কাক বলছে, 'দেবে বই কি!'

খানিকবাদে একটু শব্দ হল, আর অমনি কাক বলল, 'ঐ ! এবারে বাড়ছে !'

খানিকবাদে আর একটু শব্দ হল, অমনি কাক বলল, 'ঐ ! এবারে খাচ্ছে !'

সত্যি-সত্যি ব্রাহ্মণ আর তাঁর মেয়ে তখন খেতে বসেছিলেন। সে পায়েস এতই ভালো হয়েছিল যে, তাঁরা দুজনেই তা প্রায় শেষ করে ফেললেন। ব্রাহ্মণীর জন্যে খুব কমই রইল। তারপর ব্রাহ্মণীর খাওয়া যখন শেষ হল, তখন পাতে বা হাঁড়িতে পায়েসের একটু দাগ অবধি রইল না।

কাক এতক্ষণ বসে থেকেও যখন কিছু খেতে পেল না, তখন তার বড্ড রাগ হল। সে মনে-মনে বলল, 'আমাকে এমন করে ঠকালে ! এর শোধ দিতেই হবে !'

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাছেই একটা প্রকাণ্ড বন ছিল, সেই বনে মস্ত একটা বাঘ থাকত।

কাক দুষ্টু ফন্দি এঁটে সেই বাঘকে গিয়ে বলল, বাঘমশাই, আমাদের ব্রাহ্মণঠাকুরের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। আপনি এমন সুন্দর বর, আপনার সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে ভালো হয়।'

বাঘ বলল, 'বিয়ে ঠিক করে দেবে কে? আমি কথা কইতে গেলে তো তারা ছুটে পালাবে !'

কাক বলল, 'আপনার কিছু করতে হবে না, আমি সব করে দিচ্ছি। আগে আপনি ব্রাহ্মণকে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন।'

বাঘ বলল, 'বেশ কথা ! আমি গ্রামে গিয়ে কুত্তা মেরে বামুনের বাড়ি রেখে আসব।'

কাক তা শুনে জিভ কেটে বলল, 'না-না ! তারা কুত্তা খাবে না ! আপনার বাড়িতে যে লেবুর গাছ আছে, সেই গাছের লেবু পাঠিয়ে দিন। আমি লেবু নিয়ে যাব এখন।'

বলে সে কয়েকটা লেবু নিয়ে ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিয়ে এসে বলল, 'বাঘমশাই, তারা তো লেবু খেয়ে ভারি খুশি হয়েছে। এমনি করে দিনকতক লেবু দিলেই মেয়ে বিয়ে দেবে।'

শুনে বাঘ আহ্লাদে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

এমনি করে কাক রোজ লেবু নিয়ে যায় আর বাঘকে এসে বলে, 'তারা মেয়ে বিয়ে দেবে।' আসলে সেটা মিথ্যে কথা, কিন্তু বাঘ মনে করে, ব্রাহ্মণ বুঝি সত্যি-সত্যি মেয়ে দেবে বলছে।

তারপর একদিন বাঘ বলল, 'কই, লেবু তো ফুরিয়ে গেল, মেয়ে তো বিয়ে দিলে না !'

কাক বলল, 'দেবে বইকি ! আপনি যখন চাইবেন, তক্ষুনি দেবে।'

শুনে বাঘ বলল, 'তবে তাদের বল্ গিয়ে যে, যদি কাল রাত্রে মেয়ে বিয়ে না দেয়, তাহলে তাদের সবাইকে চিবিয়ে খাব।'

কাক তো তাই চায়! সে তক্ষুনি ব্রাহ্মণের বাড়ি গিয়ে বলল, 'ওগো, শুনছ? কাল রাত্রে বাঘ আসবে, তোমাদের মেয়ে বিয়ে করতে। যদি বিয়ে না দাও, সকলকে চিবিয়ে খাবে।'

এ-কথা শুনেই তো ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কান্না শুনে গ্রামের লোক ছুটে এসে বলল, 'কী হয়েছে?'

ব্রাহ্মণ কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, 'কাল বাঘ আসবে, আমাদের মেয়েকে বিয়ে করতে। বিয়ে না দিলে সকলকে চিবিয়ে খাবে।'

শুনে গ্রামের লোক বলল, 'এই কথা! আচ্ছা, দেখা যাবে বেটা কেমন বিয়ে করে, আর না দিলে চিবিয়ে খায়! আপনার কোনো ভয় নেই, আমরা সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

বাঘ-বর

বলে তারা বাঘের কাছে খবর পাঠিয়ে দিল, 'বাঘমশাই আপনার মতন এমন ভালো বর কী আর হবে! আপনি পোশাক পরে আসবেন, সভার মাঝে বসবেন, গানবাজনা শুনবেন, নিমন্ত্রণ খাবেন, তারপর বেশ ভালোমতো বিয়ে করে চলে যাবেন।'

তারপর তারা ব্রাহ্মণের উঠানে তিনশো উনুন কেটে তাতে তিনশো হাঁড়ি তেল চড়াল। কুয়োর উপরে চমৎকার বিছানা করে রাখল। তারপর ঢাকঢোল বাজিয়ে খুব শোরগোল করতে লাগল।

বাঘ সেই গোলমাল শুনে বলল, 'ঐরে, আমার বিয়ের ধুম লেগেছে!' তখন সে তাড়াতাড়ি জামা জোড় পরে, পাগড়ি এঁটে নাচতে-নাচতে এসে ব্রাহ্মণের বাড়ি উপস্থিত হল।

অমনি সকলে 'আরে, বর এসেছে! বাজা,বাজা!' বলে বাঘমশাইকে সেই কুয়োর উপরকার বিছানা দেখিয়ে দিল। বাঘমশাই তো তাতে লাফিয়ে বসতে গিয়েই, 'ঘেঁয়াও' করে বিছানাসুদ্ধ কুয়োয় পড়েছেন, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের সকলে মিলে সেই তিনশো হাঁড়ির গরম তেল, আর তিনশো উনুনের আগুন কুয়োয় এনে ঢেলেছে।

তারপর দেখতে-দেখতে বোকা বাঘ পুড়ে ছাই হল, ব্রাহ্মণেরও আপদ কেটে গেল।

কাক তামাশা দেখবার জন্য ঘরের চালে বসে ছিল, পাড়ার ছেলেরা ঢিল ছুড়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দিল।

বাঘের উপর টাগ

এক জোলা ছিল। তার একটি বড় আদুরে ছেলে ছিল। সে যখন যা চাইত, সেটি না নিয়ে কিছুতেই ছাড়ত না।

একদিন এক বড়মানুষের ছেলে জোলার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে জোলার ছেলেও তার বাপকে ডেকে বলল, 'বাবা, আমার কেন ঘোড়া নেই? আমাকে ঘোড়া এনে দাও।'

জোলা বলল, 'আমি গরিব মানুষ, ঘোড়া কী করে আনব? ঘোড়া কিনতে ঢের টাকা লাগে।'

ছেলে বলল, 'তা হবে না! আমাকে ঘোড়া এনে দিতেই হবে!'

বলে, সেই ছেলে আগে নেচে-নেচে কাঁদল, তারপর গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, তারপর উঠে তার বাপের হুঁকো-কলকে ভেঙে ফেলল। তাতেও ঘোড়া কিনে দিচ্ছে না দেখে, শেষে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিল।

ঘোড়ার ডিম

তখন জোলা তো ভারি মুশকিলে পড়ল। ছেলে কিছুতেই খাচ্ছে না দেখে ভাবল, 'এখন তো আর ঘোড়া কিনে না দিলেই হচ্ছে না! দেখি, ঘরে কিছু টাকা আছে কিনা।'

অনেক খুঁজে সে কয়েকটি টাকা বার করল। তারপর সেই টাকা কাপড়ে বেঁধে সে ঘোড়া কিনতে হাটে চলল।

হাটে উপস্থিত হয়ে জোলা ঘোড়াঅলাকে জিগগেস করল, 'হ্যাঁ গা, তোমার ঘোড়ার দাম ক-টাকা?'

ঘোড়াঅলা বলল, 'পঞ্চাশ টাকা।'

জোলা কাপড়ে বেঁধে মোটে পাঁচটি টাকা এনেছে, পঞ্চাশ টাকা সে কোথা থেকে দেবে? কাজেই সে ঘোড়া কিনতে না পেরে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে চলল।

এমন সময় হয়েছে কী—দুজন লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে। তাদের একজন বলল, 'তোমার কিন্তু বড় মুশকিল হবে।'

তা শুনে আরেকজন বলল, 'ঘোড়ার ডিম হবে!'

ঘোড়ার কিনা ডিম হয় না, তাই 'ঘোড়ার ডিম হবে' বললে বুঝতে হয় যে 'কিচ্ছু হবে না,' কিন্তু জোলা সে-কথা জানত না। সে ঘোড়ার ডিমের নাম শুনেই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ভাই, ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?'

সেখানে একটা ভারি দুষ্টু লোক ছিল। সে জোলাকে বলল, 'আমার সঙ্গে এস, আমার ঘরে ঘোড়ার ডিম আছে।'

সে দুষ্ট লোকটার ঘরে ছিল একটা ফুটি। সে জোলাকে তার সঙ্গে বাড়ি নিয়ে, সেই ফুটিটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নাও ঘোড়ার ডিম। দেখ, কেমন ফেটে রয়েছে! এখুনি এর ভিতর থেকে ছানা বেরুবে। দেখো, ছুটে পালায় না যেন!'

তখন জোলার আনন্দ দেখে কে!

সে জিগগেস করল, 'এর দাম কত?'

দুষ্টু লোকটা বলল, 'পাঁচ টাকা।' জোলা তখুনি সেই পাঁচটা টাকা খুলে দিয়ে, ফুটি নিয়ে ঘরে চলল। ফুটি ফেটে রয়েছে, ভিতরে লাল দেখা যাচ্ছে। জোলা ভাবল, 'ঐ রে, ছানা যদি বেরিয়ে পালাতে চায়, তখুনি খপ্ করে ধরে ফেলব। তারপর গলায় চাদর বেঁধে তাকে বাড়ি নিয়ে যাব। যদি লাফায়, তবু ছাড়ব না!'

জোলার ঘোড়ার ছানা পালাচ্ছে

এমনি নানান কথা ভাবতে-ভাবতে জোলা একটা নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল, আর ঠিক তখুনি তার ভয়ানক জলতেষ্টা পেল। জোলা ডাঙার উপর ফুটিটা রেখে জল খেতে গিয়েছে, এর মধ্যে যে কোথা থেকে এক শিয়াল সেখানে এসেছে, সে তা দেখতে পায় নি। তার জল খাওয়া হতে-হতে শিয়ালও ফুটি প্রায় শেষ করে এনেছে। এমন সময় জোলা তাকে দেখতে পেয়েই, 'হায় সর্বনাশ! আমার ঘোড়ার ছানা পালাল!' বলে তাড়া করল।

শিয়ালকে ছুটে ধরা কি জোলার কাজ! সে শিয়াল তাকে মাঠের উপর দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, কোথায় নিয়ে গেল তার ঠিকানা নেই। শেষে জোলা আর চলতে পারে না। তখন ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে, পথ হারিয়ে গেছে।

তখন রাত হয়েছে, কাজেই আর ঘরে ফিরবার জো ছিল না। জোলা অনেক খুঁজে এক বুড়ির বাড়িতে গিয়ে শোবার জায়গা চেয়ে নিল। বুড়ির দুটি বই ঘর ছিল না। তার একটিতে বুড়ি আর তার নাতনি থাকত। আর একটিতে জিনিসপত্র ছিল, সেইটিতে সে জোলাকে জায়গা দিল।

একটা বাঘ রোজ রাত্রে বুড়ির ঘরের পেছনে এসে বসে থাকত। বুড়ি তা টের পেয়ে রাত্রে কখনো ঘরের বাইরে আসত না, তার নাতনিকেও আসতে দিত না। কিন্তু নাতনিটি জোলার কাছে তার ঘোড়ার ডিমের কথা একটু শুনতে পেয়েছিল, তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে আবার তার কাছে যেতে চাইল। তখন বুড়ি তাকে বলল, 'না না, যাস্‌নে! বাঘে-টাগে ধরে নেবে!'

'বাঘে-টাগে' এমনি করে লোকে বলে থাকে। টাগ বলে কোনো জন্তু নেই। কিন্তু বাঘ তো আর এ-কথা জানে না, সে ঘরের পিছনে বসে টাগের কথা শুনে ভারি ভাবনায় পড়ে গেছে। সে ঠিক বুঝে নিয়েছে যে, টাগ তার নিজের চেয়েও ঢের ভয়ানক একটা জানোয়ার বা রাক্ষস

বা ভূত হবে। আর তখন থেকে তার বেজায় ভয় হয়েছে, আর সে ভাবছে টাগ এলে কোন্‌খান দিয়ে পালাবে।

এমন সময় সেই জোলা ভোর হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে বাইরে এসেছে। এসেই সে বাঘকে দেখতে পেয়ে মনে করল, 'ঐ রে! আমার ঘোড়ার ছানা বসে আছে!'

অমনি সে ছুটে গিয়ে, বাঘের নাকে মুখে গলায় কাপড় জড়িয়ে তড়াক করে তার পিঠে উঠে বসল।

বাঘ যে তখন কী ভয়ানক চমকে গেল কী বলব! সে ভাবল, 'হায়-হায়! সর্বনাশ হয়েছে! নিশ্চয় আমাকে টাগে ধরেছে!' এই মনে করে বাঘ প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু চোখে কাপড় বাঁধা ছিল বলে ভালো করে ছুটতে পারল না।

জোলা বাঘের পিঠে চড়েছে

জোলা তো গোড়া থেকেই তার পিঠে চড়ে বসে আছে, আর ভাবছে সেটা তার ঘোড়ার ছানা! সে ঠিক করে রেখেছে যে, একটু ফরসা হলেই পথ চিনতে পারবে, আর ঘোড়ার ছানাটিকে নিয়ে বাড়ি যাবে। ফরসা যখন হল, তখন জোলা দেখল যে, কাজ তো হয়েছে! সে ঘোড়া মনে করে বাঘের উপর চড়ে বসেছে! তখন আর সে কী করে? সে ভাবল যে এবার আর রক্ষা নেই!

বাঘ ছুটছে আর বলছে, 'দোহাই টাগদাদা! আমার ঘাড় থেকে নামো, আমি তোমায় পুজো করব!' জোলা জানে না যে বাঘ তাকেই টাগ বলছে। জোলা খালি ভাবছে, কী করে পালাবে।

এমন সময় বাঘ একটা বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই গাছের ডালগুলি খুব নিচু, হাত বাড়ালেই ধরা যায়। জোলা খপ্ করে তার একটা ডাল ধরে ঝুলে গাছে উঠে পড়ল।

তখন জোলাও বলল, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

বাঘও বলল, 'বড্ড বেঁচে গিয়েছি!'

কিন্তু খালি গাছে উঠলে কী হবে? তা থেকে নামতে পারলে তো হয়। সে হতভাগা বাঘটা সেখান থেকে না পালিয়ে গাছতলায় বসে হাঁপাতে লাগল, আর চেঁচিয়ে অন্য বাঘদের ডাকতে লাগল। ডাক শুনে চার-পাঁচটা বাঘ সেখানে এসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার? তোমার চোখ বাঁধল কে?'

বাঘ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'আরে ভাই, আজ আর-একটু হলেই গিয়েছিলুম আর কী! আমাকে টাগে ধরেছিল! অনেক হাতজোড় করে পুজো দেব বলতে, তবে ছেড়ে দিয়েছে। সেই বেটা আমার চোখ বেঁধে রেখেছে, পুজো না দিলে আবার এসে ধরবে।'

এই কথা শুনে সব বাঘ মিলে সেই গাছতলায় টাগের পুজো আরম্ভ করল। বড়-বড় মোষ আর হরিণ নিয়ে দলেদলে বাঘ আসতে লাগল। জোলা আর অত বাঘ কখনো দেখে নি। সে তো গাছে বসে কেঁপেই অস্থির।

গাছের উপর ওটা কী?

জোলা কাঁপছে, আর গাছের পাতা নড়ছে। বাঘেরা তাতে ব্যস্ত হয়ে চেয়ে দেখল, কিন্তু পাতার আড়ালে ছিল বলে জোলাকে চিনতে পারল না।

একজন বলল, 'ভাই, গাছের উপর ওটা কী?'

আর-একজন বলল, 'দেখ ভাই, ওটার কী মস্ত লেজ।'

লেজ তো নয়, জোলার কাপড় ঝুলছিল। পাতার জন্যে ভালো করে দেখতে না পেয়ে বাঘেরা তাকেই লেজ মনে করেছে। সেই লেজ দেখে একটা বুড়ো বাঘ বলল, 'ওটা একটা খুব ভয়ানক জানোয়ার হবে, হয়তো-বা টাগই হবে!' এই কথা শুনেই তো সব বাঘ মিলে 'ধরল, ধরল! পালা, পালা!' বলে সেখান থেকে ছুটে পালাল। তখন জোলাও গাছ থেকে নেমে বাড়ি গেল।

জোলাকে দেখে তার ছেলে বলল, 'কই বাবা, ঘোড়া কই?'

জোলা তার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলল, 'এই নে তোর ঘোড়া!'

তারপর থেকে আর সে ছেলে ঘোড়ার কথা বলত না।

বাঘের পালকি চড়া

বাঘ কিনা মামা, আর শিয়াল কিনা ভাগ্নে, তাই দুজনের মধ্যে বড্ড ভাব।

শিয়াল একদিন বাঘকে নিমন্ত্রণ করল, কিন্তু তার জন্যে খাবার কিছু তয়ের করল না। বাঘ যখন খেতে এল, তখন তাকে বলল, 'মামা একটু বস। আর দু-চারজনকে নিমন্ত্রণ করেছি, তাদের ডেকে নিয়ে আসি।'

এই বলে শিয়াল চলে গেল, আর সে-রাত্রে বাড়ি ফিরল না। বাঘ সারারাত বসে থেকে, সকালবেলা শিয়ালকে বকতে-বকতে বাড়ি চলে গেল।

তারপর একদিন বাঘ শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করল। শিয়াল এলে তাকে খেতে দিল মস্ত-মস্ত মোটা-মোটা হাড়। তার এক-একটা লোহার মতো শক্ত। শিয়াল বেচারার চারটে দাঁত ভেঙে গেল, তবু সেই হাড়ের একটুও সে চিবিয়ে ভাঙতে পারল না। বাঘ ঐরকম হাড় খেতেই খুব

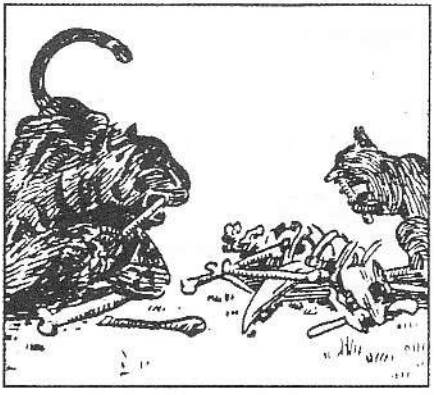

শিয়াল নিমন্ত্রণ খাচ্ছে

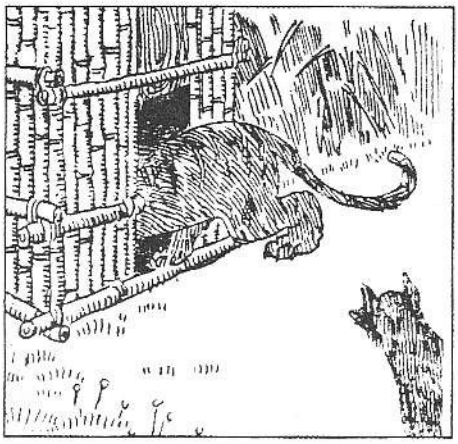

বাঘ খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকছে

ভালোবাসে। সে মনের সুখে পেটভরে সব হাড় চিবিয়ে খেল, আর বলল, 'কী ভাগ্গে, পেট ভরল তো?'

শিয়াল হাসতে-হাসতে বলল, 'হ্যাঁ মামা, আমার বাড়িতে তোমার যেমন পেট ভরেছিল, তোমার বাড়িতেও আমার তেমনি পেট ভরেছে।' মনে মনে কিন্তু তার ভয়ানক রাগ হল, আর সে বলল, 'যদি বাঘমামাকে জব্দ করতে পারি তবে দেশে ফিরব, নইলে আর দেশে ফিরব না।'

এই মনে করে শিয়াল সে-দেশ ছেড়ে আর-এক দেশে চলে গেল। সে নতুন দেশে অনেক আখের ক্ষেত ছিল। শিয়াল সেই আখের ক্ষেতে থাকত আর খুব করে আখ খেত। যা খেতে পারত না, ভেঙে রেখে দিত।

চাষিরা বলল, 'ভালো রে ভালো, এমন করে আমাদের আখ কোন্ দুষ্টু শিয়াল ভেঙে রেখে দেয়? বেটাকে এর সাজা দিতে হবে!' বলে তারা ক্ষেতের পাশে এক খোঁয়াড় তয়ের করল।

কাঠ দিয়ে ছোট্ট ঘরের মতন করে খোঁয়াড় তয়ের করতে হয়। তার ভিতরে কোনো জন্তু ঢুকলে তার দরজা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তাতেই সেই জন্তু খোঁয়াড়ের ভিতর আটকা পড়ে।

চাষিরা যখন খোঁয়াড় তয়ের করছে, তখন শিয়াল হাসছে আর বলছে, 'আমার জন্যে, না মামার জন্যে? এমন সুন্দর ঘরে মামা থাকলেই ভালো হয়!'

তার পরদিনই সে বাঘকে গিয়ে বলল, 'মামা, একটা বড় নিমন্ত্রণ তো এসেছে! রাজার ছেলের বিয়ে, সেখানে আমি গান গাইব, আর তুমি বাজাবে। আর খাব যা, তার তো কথাই নেই! তারা পালকি পাঠিয়েছে, যাবে মামা?'

বাঘ বলল, 'তা আর যাব না! এমন নিমন্ত্রণটা কি ছাড়তে আছে! আবার তারা পালকিও পাঠিয়েছে!'

শিয়াল বলল, 'সে কি যে-সে পালকি? এমন পালকিতে আর কখনো চড় নি মামা!' এমনি কথাবার্তা বলে দুজনে সেই আখের ক্ষেতের ধারে এল, যেখানে সেই খোঁয়াড় রয়েছে। খোঁয়াড় দেখে বাঘ বলল, 'খালি পালকি পাঠিয়েছে, বেয়ারা পাঠায় নি যে?'

শিয়াল বলল, 'আমরা উঠে বসলেই বেয়ারা আসবে এখন।'

বাঘ বলল, 'পালকির যে ডাণ্ডা নেই, বেয়ারারা কী করে বইবে?'

শিয়াল বলল, 'ডাণ্ডা তারা সঙ্গে আনবে।'

এ-কথা শুনে বাঘ যেই খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকেছে, অমনি ধড়াস করে তার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন শিয়াল বলল, 'মামা, দরজাটা যে বন্ধ করে দিলে, এখন আমি ঢুকব কী করে?'

বাঘ বলল, 'তোমার ঢুকে কাজ নেই। এবারের নিমন্ত্রণটা আমিই খাইগে।'

শিয়াল বলল, 'বেশ কথা মামা! খুব ভালো করে পেটভরে নিমন্ত্রণ খেও। কম খেও না যেন!'

এই বলে শিয়াল হাসতে-হাসতে তার দেশে চলে গেল।

তারপর চাষিরা এসে দেখল যে, বাঘমশাই খোঁয়াড়ের ভিতরে বসে আছেন। তখন তারা যে কী খুশি হল, কী বলব!

তারা সকলকে ডেকে বলল, 'আন্ খন্তা, আন্ বল্লম, আন্ যে যা পারিস! খোঁয়াড়ে বাঘ পড়েছে! আয় তোরা কে কোথায় আছিস!'

অমনি সকলে ছুটে এসে বাঘকে মেরে শেষ করল।

বুদ্ধুর বাপ

এক-যে ছিল বুড়ো চাষি, তার নাম ছিল বুদ্ধুর বাপ।

বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতে ধান পেকেছে, আর দলে দলে বাবুই এসে সেই ধান খেয়ে ফেলছে। বুদ্ধুর বাপ ঠকঠকি বানিয়ে তাই দিয়ে বাবুই তাড়াতে যায়। কিন্তু ঠকঠকির শব্দ শুনেও বাবুই পালায় না। তখন সে রেগেমেগে বলল, 'বেটারা! একবার যদি ধরতে পারি, তাহলে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন বলে কোনো একটা জিনিস নেই। বুদ্ধুর বাপ আর কোনো ভয়ানক গাল খুঁজে না পেয়ে ঐ কথা বলে। রোজই বাবুই আসে, রোজই বুদ্ধুর বাপ তাদের তাড়াতে না পেরে বলে, ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব।'

বাবুই তাড়াচ্ছে

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কী—একটা মস্ত বাঘ রাত্রে এসে বুদ্ধুর বাপের ক্ষেতের ভিতর ঘুমিয়ে ছিল ; ঘুমের ভিতরে কখন সকাল হয়ে গেছে, আর সে-বাঘ সেখান থেকে যেতে পারে নি। সেদিনও বুদ্ধুর বাপ বাবুই তাড়াতে এসে ঠকঠকি নাড়ছে আর বলছে, 'বেটারা, যদি ধরতে পারি তবে ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখিয়ে দেব!'

ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন শুনেই তো বাঘের বেজায় ভাবনা হয়েছে। সে ভাবল, 'তাই তো! এটা আবার কী নতুন রকমের জিনিস হল? এমন বাঁধনের কথা তো কখনো শুনি নি!' যতই ভাবছে, ততই তার মনে হচ্ছে যে, এটা না দেখলেই নয়। তাই সে আস্তে-আস্তে ধানের ক্ষেতের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বুদ্ধুর বাপকে ডেকে বলল, 'ভাই, একটা কথা আছে!'

বাঘ দেখে বুদ্ধুর বাপ যে কী ভয় পেল, তা কী বলব! কিন্তু সে ভারি বুদ্ধিমান লোক ছিল। সে তখুনি সামলে গেল, বাঘ কিছু টের পেল না। বুদ্ধুর বাপ বাঘকে বলল, 'কী কথা ভাই?'

বাঘ বলল, 'ঐযে তুমি কী বলছ, ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন না কি! সেইটে আমাকে একটিবার দেখাতে হচ্ছে।'

বুদ্ধুর বাপ বলল, 'সে তো ভাই অমনি দেখানো যায় না। তাতে ঢের জিনিসপত্র লাগে।'
বাঘ বলল, 'আমি সব জিনিস এনে দিচ্ছি। আমাকে সেটা না দেখালে হবে না।'

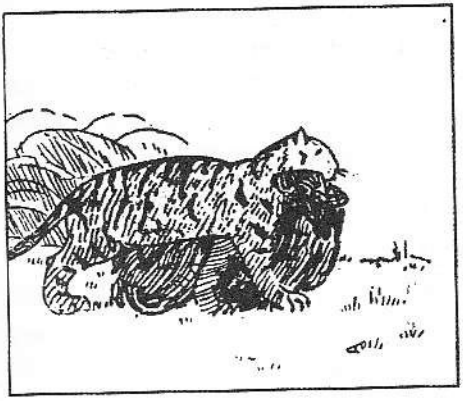

বাঘ থলে নিয়ে আসছে

বুদ্ধুর বাপ বলল, 'আচ্ছা, তুমি আগে জিনিস আনো, তারপর আমি দেখাব।'
বাঘ বলল, 'কী জিনিস চাই?'
বুদ্ধুর বাপ বলল, 'একটা খুব বড় আর মজবুত থলে চাই, একগাছি খুব মোটা আর লম্বা দড়ি চাই, আর একটা মস্ত মুগুর চাই।'
বাঘ বলল, 'শুধু এই চাই?' এসব আনতে আর কতক্ষণ?'
সেটা হাটের দিন ছিল। বাঘ গিয়ে হাটের পথের পাশে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রইল। খানিকবাদেই সে-পথ দিয়ে তিনজন খইঅলা যাচ্ছে। খইঅলাদের থলেগুলি খুব বড় হয়, আর তার এক-একটা ভারি মজবুত থাকে।

বাঘ ঝোপের ভিতর বসে আছে, আর খইঅলারা একটু একটু করে তার সামনে এসেছে। অমনি সে 'হালুম!' বলে লাফিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। খইঅলারা তো খই-টই ফেলে, চেঁচিয়ে কোথায় পালাবে তার ঠিক নেই!

তখন বাঘ তাদের খইসুদ্ধ থলেগুলি এনে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল দড়ি আনতে।

দড়ির জন্যে তার আর বেশিদূরে যেতে হল না। মাঠে ঢের গরু খোঁটায় বাঁধা ছিল, বাঘ তাদের কাছে যেতেই তারা দড়ি ছিঁড়ে পালাল। সেইসব দড়ি এনে সে বুদ্ধুর বাপকে দিল। তারপর সে গেল মুগুর আনতে।

পালোয়ানেরা তাদের আড্ডায় মুগুর ভাঁজছে, এমন সময় বাঘ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। তাতেই তো 'বাপ রে, মারে!' বলে তারা ছুট দিল। তখন বাঘ তাদের বড় মুগুরটা মুখে করে এনে বুদ্ধুর বাপকে বলল, 'তোমার জিনিস তো এনেছি, এখন সেটাকে দেখাও।'

বুদ্ধুর বাপ বলল, 'আচ্ছা, তবে তুমি একটিবার এই থলের ভিতরে এস দেখি।'

বলতেই তো বাঘমশাই গিয়ে সেই থলের ভিতরে ঢুকেছেন। তখন বুদ্ধুর বাপ তাড়াতাড়ি থলের মুখ বন্ধ করে, তাকে আচ্ছা করে দড়ি দিয়ে জড়াল। একটু নড়বার জো অবধি রাখল না।

মুগুর দিয়ে খালি মারছেই

তারপর দু-হাতে সেই মুগুর তুলে ধাঁই করে সেই থলের উপর যেই এক ঘা লাগিয়েছে, অমনি বাঘ ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ও কী করছ?'

বুদ্ধুর বাপ বলল, 'কেন? ইঁড়ি-মিড়ি-কিঁড়ি-বাঁধন দেখাচ্ছি। তোমার ভয় হয়েছে নাকি?'

ভয় হয়েছে বললে তো বড় লজ্জার কথা হয়, তাই বাঘ বলল, 'না।'

তখন বুদ্ধুর বাপ সেই মুগুর দিয়ে ধাঁই-ধাঁই করে থলের উপর মারতে লাগল। চ্যাঁচালে পাছে নিন্দে হয়, তাই মার খেয়েও বাঘ অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু চুপ করে আর কতক্ষণ থাকবে! দশ-বারো ঘা খেয়েই সে ঘেঁয়াও-ঘেঁয়াও করে ভয়ানক চ্যাঁচাতে লাগল। খানিকবাদে আর চ্যাঁচাতে না পেরে, গোঙাতে আরম্ভ করল। বুদ্ধুর বাপ তবুও ছাড়ছে না, ধাঁই-ধাঁই করে সে খালি মারছেই। শেষে আর বাঘের সাড়াশব্দ নেই দেখে সে ভাবল, মরে গেছে। তখন থলে খুলে, বাঘটাকে ক্ষেতের ধারে ফেলে রেখে, বুদ্ধুর বাপ ঘরে এসে বসে রইল।

লেজ কেটে ফেললে

বাঘ কিন্তু মরে নি। চার-পাঁচ ঘণ্টা মরার মতো পড়ে থেকে, তারপর সে উঠে বসেছে। তখনো তার গায়ে বড্ড বেদনা, আর জ্বরও খুব। কিন্তু রাগের চোটে সে-সবে সে মন দিল না। সে খালি চোখ ঘোরায় আর দাঁত খিচোয়, আর বলে, 'বেটা বুদ্ধুর বাপ! পাজি, হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!'

সেই কথা শুনেই তো ভয়ে বুদ্ধুর বাপের মুখ শুকিয়ে গেল। সে তখুনি ঘরে দোর দিয়ে হুড়কো এঁটে বসে রইল। তিনদিন আর ঘর থেকে বেরুল না।

বাঘ সেই তিনদিন বুদ্ধুর বাপের ঘরের চারিধারে ঘুরে বেড়াল, আর তাকে গালি দিল। তারপর করেছে কী—দরজার কাছে এসে খুব ভালোমানুষের মতন করে বলছে, 'আমাকে একটু আগুন দেবে দাদা? তামাক খাব।'

বুদ্ধুর বাপ দেখল, কথাগুলি মানুষের মতো, কিন্তু গলার আওয়াজটা বাঘের মতো। তখন সে ভাবল, আগুন দেবার আগে একবার ভালো করে দেখে নিতে হবে। এই ভেবে সে যেই দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেছে, অমনি দেখে, সর্বনাশ—বাঘ! তখন আর কি সে দরজা খোলে! সে কোঁকাতে-কোঁকাতে বলল, 'ভাই বড্ড জ্বর হয়েছে, দোর খুলতে পারব না। তুমি দরজার নিচে দিয়ে তোমার লাঠিগাছাটা ঢুকিয়ে দাও, আমি তাতে আগুন বেঁধে দিচ্ছি।'

বাঘ লাঠি কোথায় পাবে? সে তার লেজটা দরজার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। অমনি বুদ্ধুর বাপ বঁটি দিয়ে খ্যাঁচ করে সেই লেজ কেটে ফেলল।

বাঘ তখন 'ঘেঁয়াও!' বলে বুদ্ধুর বাপের চালের সমান উঁচু লাফ দিল। তারপর একটুখানি লেজ যা ছিল, তাই গুটিয়ে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ছুটে পালাল।

তাতে কিন্তু বুদ্ধুর বাপের ভয় গেল না। সে বেশ বুঝতে পারল যে, এরপর সব বাঘ মিলে তাকে মারতে আসবে। সত্যি-সত্যি সে তার পরদিন দেখল, কুড়ি-পঁচিশটা বাঘ তার ঘরের দিকে আসছে। তখন সে আর কী করবে! ঘরের পিছনে খুব উঁচু একটা তেঁতুলগাছ ছিল, তার আগায় গিয়ে বসে রইল।

সেইখানে একটা হাঁড়ি বাঁধা ছিল। বুদ্ধুর বাপ তার পিছনে লুকিয়ে দেখতে লাগল বাঘেরা কী করে।

বাঘেরা এসেই সেই হাঁড়ির আড়ালে বুদ্ধুর বাপকে দেখতে পেয়েছে। তখন তারা তাকে গাল দেয়, ভ্যাঙচায় আর কতরকম ভয় দেখায়! বুদ্ধুর বাপ চুপটি করে হাঁড়ি ধরে বসে আছে, কিচ্ছু বলে না।

বাঘের উপর বাঘ

তারপর বাঘেরা মিলে বুদ্ধুর বাপকে ধরবার এক ফন্দি ঠিক করল। তাদের মধ্যে যার খুব বুদ্ধি ছিল সে বলল, 'আমাদের মধ্যে যে সকলের বড়, সে মাটিতে গুড়ি মেরে বসবে। তারচেয়ে যে ছোট, সে তার ঘাড়ে উঠবে। তারচেয়ে যে ছোট, সে আবার তার ঘাড়ে উঠবে। এমনি করে উঁচু হয়ে, ঐ হতভাগাকে ধরে খাব।'

তাদের মধ্যে সকলের বড় ছিল সেই ঠেঙাখেকো লেজকাটা বাঘটা। তার লেজের ঘা তখনো শুকোয় নি বলে সে বসতে পারত না, বসতে গেলেই তার বড্ড লাগত। কিন্তু না বসলেও তো চলবে না, যেমন করেই হোক বসতে হবে। এমন সময় একটি গর্ত দেখতে পেয়ে সে সেই গর্তের ভিতরে লেজটুকু ঢুকিয়ে কোনোমতে বসল। তারপর অন্য বাঘেরা এক-একজন করে তার পিঠে উঠতে লাগল।

এমনি করে বাঘের পিঠে বাঘ উঠে দেখতে-দেখতে তারা প্রায় বুদ্ধুর বাপের সমান উঁচু হয়ে গেল। আর-একটু উঁচু হলেই তাকে ধরে ফেলবে।

বুদ্ধুর বাপ বলছে, 'যা হয় হবে, একবার শেষ এক ঘা মেরেই নি!' এই বলে সে হাঁড়িটি খুলে হাতে নিয়ে বসেছে—সেই হাঁড়ি সকলের উপরকার বাঘটার মাথায় ভাঙবে।

এমন সময় ভারি একটা মজা হয়েছে! যে গর্তে সেই লেজকাটা বাঘ তার লেজ ঢুকিয়েছিল, সেই গর্তটা ছিল এক কাঁকড়ার। কাঁকড়া কাটা-লেজের গন্ধ পেয়ে, আস্তে-আস্তে এসে তার দুই দাঁড়া দিয়ে তাতে চিমটি লাগিয়েছে। চিমটি খেয়ে বেঁড়ে বাঘ বলল, 'উহ্ হু! ঘেঁয়াও! হাল্লুম! আরে উপরেও বুদ্ধুর বাপ, নিচেও বুদ্ধুর বাপ!' বলতে-বলতেই তো সে লাফিয়ে উঠল, আর পিঠের বাঘগুলি জড়াজড়ি করে ধুপধাপ শব্দে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে বুদ্ধুর বাপ লেজকাটা বাঘের পিঠে হাঁড়ি আছড়ে ফেলে বলল, 'ধর ধর! বেঁড়ে বেটার ঘাড়ে ধর!'

এরপর কি আর বাঘের দল দাঁড়ায়? তারা লেজ গুটিয়ে কান খাড়া করে, যে যেখান দিয়ে পারল ছুটে পালাল। আর কোনোদিন তারা বুদ্ধুর বাপের বাড়ির কাছেও এল না।

বোকা বাঘ

এক রাজার বাড়ির কাছে এক শিয়াল থাকত। রাজার ছাগলের ঘরের পিছনে তার গর্ত ছিল।

রাজার ছাগলগুলি খুব সুন্দর আর মোটা-মোটা ছিল।

তাদের দেখলেই শিয়ালের ভারি খেতে ইচ্ছে হত। কিন্তু রাজার রাখালগুলির ভয়ে তাদের কাছে আসতে পারত না।

তখন শিয়াল তার গর্তের ভিতর থেকে খুঁড়তে আরম্ভ করল। খুঁড়ে-খুঁড়ে তো সে ছাগলের ঘরে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু তবুও ছাগল খেতে পেল না।

রাখালের দল তখন সেখানে বসে ছিল। তারা শিয়ালকে দেখতে পেয়েই বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে খোঁটায় বেঁধে রেখে তারা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, 'কাল এটাকে নিয়ে সকলকে তামাশা দেখাব, তারপর মারব। আজ রাত হয়ে গেছে।'

রাখালেরা চলে গেছে, শিয়াল মাথা হেঁট করে বসে আছে, এমন সময় এক বাঘ সেইখান দিয়ে যাচ্ছে।

শিয়ালকে দেখে বাঘ ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কি ভাগ্নে, এখানে বসে কী করছ?'

শিয়াল বলল, 'বিয়ে করছি।'

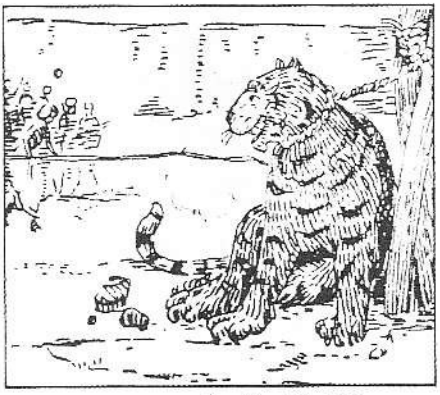

বাঘ বললে 'হাঁঃ, হাঁঃ, হিহি, হিহি!'

বাঘ বলল, 'তবে কনে কোথায়? লোকজন কোথায়?'

শিয়াল বলল, 'কনে তো রাজার মেয়ে! লোকজন তাকে আনতে গেছে।'

বাঘ বলল, 'তুমি বাঁধা কেন?'

শিয়াল বলল, 'আমি কিনা বিয়ে করতে চাই নি, তাই আমাকে বেঁধে রেখে গেছে, পাছে আমি পালাই।'

বাঘ বলল, 'সত্যি নাকি! তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না?'

শিয়াল বলল, 'সত্যি মামা! আমার বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছে না।'

তা শুনে বাঘ ভারি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তবে তোমার জায়গায় আমাকে বেঁধে রেখে তুমি চলে যাও না!'

শিয়াল বলল, 'এক্ষুনি! তুমি এসে আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর আমি তোমাকে বেঁধে রেখে যাচ্ছি।'

তখন বাঘের আনন্দ দেখে কে! সে অমনি এসে শিয়ালের বাঁধন খুলে দিল। শিয়ালও আর দেরি না করে, তাকে ভালোমতো খোঁটায় বেঁধে বলল, 'এক কথা মামা। তোমার শালারা এসে তোমার সঙ্গে হাসি-তামাশা করবে। তাতে বা তুমি চটো?'

বাঘ বলল, 'আরে না! আমি কি তাতে চটি? আমি বুঝি এতই বোকা!' এ-কথায় শিয়াল হাসতে-হাসতে চলে গেল। বাঘ ভাবতে লাগল, কখন কনে নিয়ে আসবে।

সকালবেলায় রাখালের দল এসে উপস্থিত হল। বাঘ তাদের দেখে ভাবল, 'এই আমার শালারা এসেছে। এখুনি হয়তো ঠাট্টা করবে। আর তাহলে আমাকেও খুব হাসতে হবে।'

রাখালেরা এসেছিল শিয়াল মারবার জন্যে। এসে দেখল বাঘ বসে আছে। অমনি তো ভারি একটা হৈচৈ পড়ে গেল। কেউ-কেউ পালাতে চায়, কেউ-কেউ তাদের থামিয়ে বলল, 'বাঁধা রয়েছে দেখছিস না? ভয় কী? কুড়ুল, খন্তা, বল্লম নিয়ে আয়।'

তখন একজন একটা মস্ত ইঁট এনে বাঘের গায়ে ছুড়ে মারল।

তাতে বাঘ বলল, 'হিঃ হিঃ, হিহি, হিহি!'

আর-একজন একটা বাঁশ দিয়ে গুঁতো মারল।

তাতে বাঘ বলল, 'হিঃ হিঃ, হিহি, হিহি!'

আর-একজন একটা বল্লম দিয়ে খোঁচা মারল।

তাতে বাঘ বলল, 'উহ্ হু, হুঃ! হোহো হোহো হোহো!—বুঝেছি, তোমরা আমার শালা!'

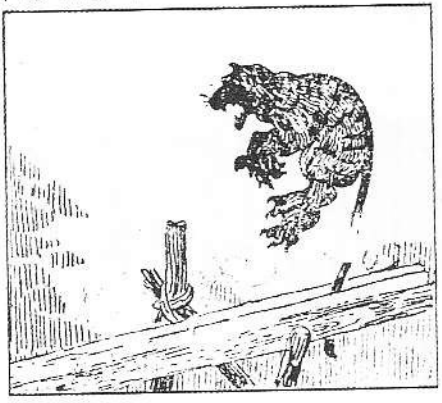

ফটাং করে লেজ দুইখান

আবার তারা বল্লমের খোঁচা মারল।

তাতে বাঘ বেজায় রেগে বলল, 'দুত্তোর! এমন ছাই বিয়ে আমি করব না!' বলে সে দড়ি ছিঁড়ে বনে চলে গেল।

বনের ভিতরে এক জায়গায় করাতিরা করাত দিয়ে কাঠ চিরত। একটা মস্ত কাঠ আধখানা চিরে রেখে, সেইখানে গোঁজ মেরে করাতিরা চলে গিয়েছে। এই সময় বাঘ বনের ভিতর এসে দেখে, শিয়াল সেই আধচেরা কাঠখানার উপরে বসে বিশ্রাম করছে।

শিয়াল তাকে দেখেই বলল, 'কি মামা, বিয়ে কেমন হল?'

বাঘ বলল, 'না ভাগ্নে, ওরা বড্ড বেশি ঠাট্টা করে! তাই আমি চলে এসেছি।'

শিয়াল বলল, 'তা বেশ করেছ! এখন এস, দুজনে বসে গল্পসল্প করি।'

বলতেই বাঘ লাফিয়ে কাঠের উপরে উঠেছে, আর বসেছে ঠিক যেখানটায় কাঠটা খুব হাঁ করে আছে, সেইখানে। তার লেজটা সেই ফাঁকের ভিতর ঢুকে ঝুলে রয়েছে।

শিয়াল দেখল যে, এবারে কাঠ থেকে গোঁজটি খুলে নিলেই বেশ তামাশা হবে। সে বাঘকে নানান কথায় ভোলাচ্ছে, আর একটু-একটু করে গোঁজটিকে নাড়ছে। নাড়তে-নাড়তে এমন করেছে যে, এখন টানলেই সেটা খুলে যাবে, আর কাঠ বাঘের লেজ কামড়ে ধরবে। তখন সে 'মামা, গেলুম!' বলে সেই গোঁজসুদ্ধ মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

আর বাঘের যে কী হল সে আর বলে কী হবে? কাঠ লেজে কামড়ে ধরতেই তো সে বেজায় চেঁচিয়ে এক লাফ দিল। সেই লাফে ফটাং করে লেজ ছিঁড়ে একেবারে দুইখান! তখন বাঘও শিয়ালের সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বাঘ বলল, 'ভাগ্নে, গেলুম! আমার লেজ ছিঁড়ে গিয়েছে!'

শিয়াল বলল, 'মামা গেলুম, আমার কোমর ভেঙে গিয়েছে!'

এমনি করে দুজনে গড়াগড়ি দিয়ে এক কচুবনে শুয়ে রইল। বাঘ আর নড়তে-চড়তে পারে না। কিন্তু শিয়াল বেটার কিচ্ছু হয় নি, সে আগাগোড়াই বাঘকে ফাঁকি দিচ্ছে।

সেই কচুবনের ভিতরে ঢের ব্যাঙ ছিল, শিয়াল শুয়েশুয়ে তাই ধরে পেট ভরে খেল। বাঘ বেদনায় অস্থির, সে ব্যাঙ দেখতেই পেল না—খাবে কী! কিন্তু তার এমনি খিদে পেয়েছে যে, কিছু না-খেলে সে মরেই যাবে। তখন সে শিয়ালকে জিগগেস করল, 'ভাগ্নে, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি?'

বাঘ নিজের হাত-পা চিবিয়ে খাচ্ছে

শিয়াল বলল, 'আর কী খাব? এই কচুই খেয়েছি। খেয়ে আমার বড্ড পেট ফেঁপেছে!'

বাঘও আর কী করে, সে কচুই চিবিয়ে খেতে লাগল। তারপর গলা ফুলে, মুখ ফুলে, সে যায় আর কী!

তা দেখে শিয়াল বলল, 'কি মামা, কিছু খেলে?'

বাঘ বলল, 'খেয়েছি তো ভাগ্নে, কিন্তু বড্ড গলা ফুলেছে। তোমার তো পেট ফেঁপেছে, আমার কেন গলা ফুলল?'

শিয়াল বলল, 'আমি কিনা শিয়াল, আর তুমি কিনা বাঘ, তাই।'

লেজের ব্যথায় আর গলার ব্যথায় বাঘ ষোলোদিন উঠতে পারল না। এই ষোলোদিন কিছু না-খেয়ে সে আধমরা হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় সে দেখল যে শিয়াল গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দিব্যি চলে যাচ্ছে। তাতে সে আশ্চর্য হয়ে জিগগেস করল, 'কি ভাগ্নে, তোমার অসুখ কী করে সারল?'

শিয়াল বলল, 'মামা, একটা ভারি চমৎকার ওষুধ পেয়েছি! আমি আমার হাত-পা চিবিয়ে খেলুম, আর তক্ষুনি আমার অসুখ সেরে গেল। তারপর দেখতে-দেখতে নতুন হাত-পা হল।'

বাঘ বলল, 'তাই নাকি? তবে আমাকে বল নি কেন?'

শিয়াল বলল, 'তুমি কি আর তোমার হাত-পা চিবিয়ে খেতে পারবে? তাই বলি নি।'

এ-কথায় বাঘ ভীষণ রেগে বলল, 'তুই শিয়াল হয়ে পারলি, আর আমি বাঘ হয়ে পারব না?'

শিয়াল বলল, 'তুমি দুটো ঠাট্টার ভয়ে অমন বিয়েটা ছেড়ে এলে! এখন যে হাত-পা চিবিয়ে খেতে পারবে তা আমি কী করে জানব?'

তখন বাঘ বলল, 'পারি কিনা এই দেখ!' বলে সে নিজের হাত-পা চিবিয়ে খেল। তারপর তিন-চারদিনের মধ্যেই ভয়ানক ঘা হয়ে সে মারা গেল।

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বাঘের রাঁধুনি

এক বাঘের বাঘিনী মরে গিয়েছিল। মরবার সময় বাঘিনী বলে গিয়েছিল, 'আমার দুটো ছানা রইল, তাদের তুমি দেখো।'

বাঘিনী মরে গেলে বাঘ বলল, 'আমি কী করে বা ছানাদের দেখব, কী করে বা ঘরকন্না করব!'

তা শুনে অন্য বাঘেরা বলল, 'আবার একটা বিয়ে কর, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বাঘ ভাবল, 'একটা বিয়ে করলে হয়। কিন্তু আর বাঘিনী বিয়ে করব না, তারা রাঁধতে-টাঁধতে জানে না। এবারে বিয়ে করব মানুষের মেয়ে, শুনেছি তারা খুব রাঁধতে পারে।'

মেয়ে আর বাঘের ছানা

এই মনে করে সে মেয়ে খুঁজতে গ্রামে গেল। সেখানে এক গৃহস্থের ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। বাঘ সেই মেয়েটিকে ধরে এনে, তার ছানাদুটোকে বলল, 'দেখ রে, এই তোদের মা!'

ছানাদুটো বলল, 'লেজ নেই, দাঁত নেই, রোঁয়া নেই, ডোরা নেই—ও কেন আমাদের মা হবে! ওটাকে মেরে দাও, আমরা খাই!'

বাঘ বলল, 'খবরদার! অমন কথা বলবি তো তোদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করব!'

তাতে ছানাদুটো চুপ করে গেল। কিন্তু সেই মেয়েটিকে তারা একেবারেই দেখতে পারত না। আর কথায়-কথায় খালি বলত, 'আর একটু বড় হলেই আমাদের গায়ে জোর হবে, তখন তোর ঘাড় ভেঙে তোকে খাব!'

সেই মেয়েটির দুঃখের কথা আর কী বলব! বাঘ যখন বাড়ি থাকে না, তখন সে তার মা-বাপ আর ভাইয়ের জন্য গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। বাঘ এলে তার ভয়ে চুপ করে থাকে। এমনি তার দিন যায়।

আর তার মা-বাপ তো কেঁদে-কেঁদে অন্ধই হয়ে গেল। তার ভাইটিও দিনকতক খুব কাঁদল, তারপর তার মা-বাপকে বলল, 'শুধু ঘরে বসে কাঁদলে কী হবে? আমি চললুম, দেখি বোনের সন্ধান করতে পারি কি না।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে, খালি বনে-বনে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে শেষে সেই বাঘের বাড়ি এসে তার বোনকে পেল।

বোনটি তো তাকে দেখেই কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'ও দাদা, তুমি কেন এলে? বাঘ এলেই যে তোমাকে ধরে খাবে!'

ভাই বলল, 'খায় খাবে! আমি তোকে না নিয়ে ফিরছি না। এখন আমাকে লুকিয়ে রাখ, তারপর দেখা যাবে।'

তখন তারা দুজনে মিলে রান্নাঘরে গর্ত খুঁড়ল। মেয়েটি সেই গর্তের ভিতরে তার ভাইকে শিল চাপা দিয়ে রাখল।

তখন তারা দুজনে মিলে রান্নাঘরে গর্ত খুঁড়ল। মেয়েটি সেই গর্তের ভিতরে তার ভাইকে শিল চাপা দিয়ে রাখল।

তারপরেই বাঘ এসে তার ছানাদুটোকে নিয়ে খেতে বসল। ছানাদুটো সেদিন ভালো করে খাচ্ছে না, খালি বলছে—

'বাবাগো বাবা, তোর কি শালা? মোর কি মামা?
মার কি সোদর ভাই?
শিলের তলে কুমকুম করে—তুলে দে না খাই!'

মেয়ে আর ভাই পালাল

বাঘ সেদিন কার উপরে চটে এসেছিল, তাই ছানাদুটোর কথা শুনেই ঠাস-ঠাস করে তাদের দুটো চড় মারল। তারা কী বলছে তা ভেবে দেখল না। খাওয়া শেষ হলে সে মেয়েটিকে বলল, 'আজ পিঠে করিস, বিকেলে খাব। দেখিস যেন ভালো হয়।' এই বলে সে আবার বেরিয়ে গেল।

বাঘ চলে গেলে মেয়েটি শিলের নিচ থেকে তার ভাইকে বার করল। তারপর দুজনে খাওয়াদাওয়া সেরে, উনুন ধরিয়ে, তার উপর কড়ায় করে তেল চড়াল। তারপর বাঘের ছানাদুটোকে কেটে, উনুনের উপর ঝুলিয়ে রেখে, তারা সেখান থেকে ছুটে পালাল।

বাঘের ছানা উনুনের উপর ঝুলছে, আর ঝ্যাঁৎ-ঝ্যাঁৎ করে রক্তের ফোঁটা তপ্ত তেলে পড়ছে।

বিকেলে বাঘ ফিরে এসে ঘরে ঢুকবার আগেই সেই শব্দ শুনতে পেল। শুনে সে বলল, 'বাহ্ রে বা! ঐ পিঠে হচ্ছে! পিঠে যদি ভালো হয় তো ভালো, নইলে আমরা তিন বাপবেটায় মিলে রাঁধুনি হতভাগীকে ছিঁড়ে খাব!'

তারপর ঘরে ঢুকেই তো দেখল কীরকম পিঠে হচ্ছে! তখন বাঘ 'হালুম হালুম' করে ঘরময় খুঁজতে লাগল। কিন্তু গৃহস্থের মেয়েকে আর কোথায় পাবে! সে ততক্ষণে তার ভাইকে নিয়ে মা-বাপের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর গ্রামের সকল লোক ছুটে এসে তাদের নিয়ে কী আনন্দই যে করছে কী বলব!

বোকা কুমিরের কথা

কুমির আর শিয়াল মিলে চাষ করতে গেল। কিসের চাষ করবে? আলুর চাষ। আলু হয় মাটির নিচে। তার গাছ থাকে মাটির উপরে, তা দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বোকা কুমির সে-কথা জানত না। সে ভাবল বুঝি আলু তার গাছের ফল।

তাই সে শিয়ালকে ঠকাবার জন্যে বলল, 'গাছের আগার দিক কিন্তু আমার, আর গোড়ার দিক তোমার।'

শুনে শিয়াল হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে।'

তারপর যখন আলু হল, কুমির তখন সব গাছের আগা কেটে তার বাড়িতে নিয়ে এল। এনে দেখে তাতে একটাও আলু নেই। তখন সে মাঠে গিয়ে দেখল, শিয়াল মাটি খুঁড়ে সব আলু তুলে নিয়ে গেছে। কুমির ভাবল, 'তাই তো! এবার বড্ড ঠকে গিয়েছি! আচ্ছা আসছে বার দেখব!'

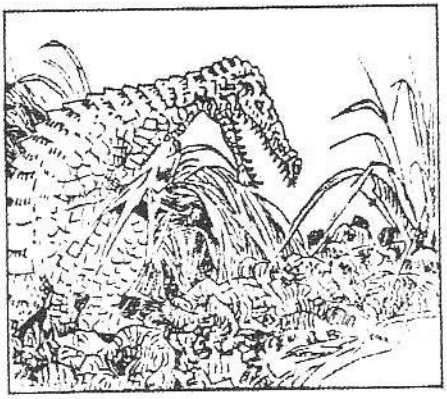

মাটি খুঁড়ে দেখে কিছু নেই

তার পরের বার হল ধানের চাষ। এবারে কুমির মনে ভেবেছে, আর কিছুতেই ঠকতে যাবে না। তাই সে আগে থাকতেই শিয়ালকে বলল, 'ভাই, এবারে কিন্তু আমি আগার দিক নেব না, এবার আমাকে গোড়ার দিক দিতে হবে।'

শুনে শিয়াল হেসে বলল, 'আচ্ছা তাই হবে!'

তারপর যখন ধান হল, শিয়াল সে ধানসুদ্ধ গাছের আগা কেটে নিয়ে গেল। কুমির তো এবারে ভারি খুশি হয়ে আছে। ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব ধান তুলে নেবে। ও কপাল! মাটি খুঁড়ে দেখে, সেখানে কিছুই নেই। লাভের মধ্যে খড়গুলো গেল।

তখন কুমির তো বড্ড চটেছে, আর বলছে, 'দাঁড়াও শিয়ালের বাছা, তোমাকে দেখাচ্ছি! এবারে আর আমি তোমাকে আগা নিতে দেব না। সব আগা আমি নিয়ে আসব।'

সেবারে হল আখের চাষ।

কুমির তো আগেই বলেছে, এবারে আর সে আগা না নিয়ে ছাড়বে না। কাজেই শিয়াল তাকে আগাগুলো দিয়ে, নিজে আখগুলো নিয়ে ঘরে বসে মজা করে খেতে লাগল।

কুমির আখের আগা ঘরে এনে চিবিয়ে দেখল, খালি নোন্তা, তাতে একটুও মিষ্টি নেই। তখন সে রাগ করে আগাগুলো ফেলে দিয়ে শিয়ালকে বলল, 'না ভাই, তোমার সঙ্গে আর আমি চাষ করতে যাব না, তুমি বড্ড ঠকাও!'

শিয়াল পণ্ডিত

কুমির দেখল, সে শিয়ালের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তখন সে ভাবল, 'ও ঢের লেখাপড়া জানে, তাতেই খালি আমাকে ফাঁকি দেয়। আমি মূর্খ লোক, তাই তাকে আঁটতে পারি না।' অনেকক্ষণ ভেবে কুমির এই ঠিক করল যে, নিজের সাতটা ছেলেকে শিয়ালের কাছে দিয়ে খুব করে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তার পরের দিনই সে ছানা সাতটাকে সঙ্গে করে শিয়ালের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। শিয়াল তখন তার গর্তের ভিতরে বসে কাঁকড়া খাচ্ছিল। কুমির এসে ডাকলে, 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত, বাড়ি আছ?'

শিয়াল বাইরে এসে বলল, 'কি ভাই, কী মনে করে?'

কুমির বলল, 'ভাই, এই আমার ছেলে সাতটাকে তোমার কাছে এনেছি। মূর্খ হলে করে খেতে পারবে না। ভাই, তুমি যদি এদের একটু লেখাপড়া শিখিয়ে দাও!'

শিয়াল বলল, 'সে আর বলতে? আমি সাতদিনে সাতজনকে পড়িয়ে পণ্ডিত করে দেব।' শুনে কুমির তো খুব খুশি হয়ে ছানা সাতটাকে রেখে চলে গেল।
তখন শিয়াল তাদের একটাকে আড়ালে নিয়ে বলল—

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, তাকে খেয়ে ফেলল।

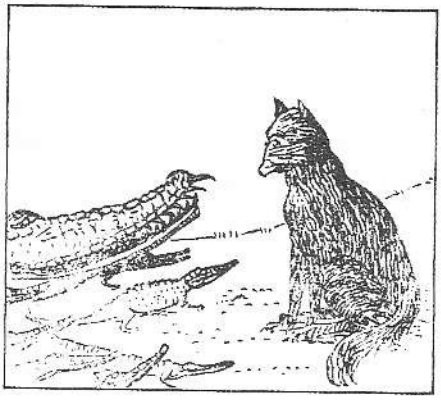

কুমির তার সাত ছানা আর শিয়াল

পরদিন যখন কুমির তার ছানা দেখতে এল, তখন শিয়াল তাদের একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে দেখাতে লাগল। ছয়টিকে ছয়বার দেখাল, শেষেরটা দেখাল দুবার। বোকা কুমির তা বুঝতে না পেরে ভাবল, সাতটাই দেখানো হয়েছে। তখন কুমির চলে গেল, আর অমনি শিয়াল তাদের একটাকে আড়ালে নিয়ে বলল—

'পড় তো বাপু—কানা খানা গানা ঘানা,
কেমন লাগে কুমির ছানা?'

এই কথা বলে, সেটার ঘাড় ভেঙে, তাকে খেয়ে ফেলল।

পরদিন যখন কুমির তার ছানা দেখতে এল, তখন শিয়াল তাদের একেকটি করে গর্তের বাইরে এনে পাঁচবার পাঁচটাকে দেখাল, শেষেরটি দেখাল তিনবার। তাতেই কুমির খুশি হয়ে চলে গেল। তখন শিয়াল ঠিক আগের মতো করে আর একটা ছানাকে খেল।

এমনি করে সে রোজ একটি ছানা খায়, আর কুমির এলে তাকে ফাঁকি দিয়ে ভোলায়। শেষে যখন একটি ছানা বই আর রইল না, তখন সেই একটিকেই সাতবার দেখিয়ে সে কুমিরকে বোঝাল। তারপর কুমির চলে গেলে সেটিকেও খেয়ে ফেলল। তারপর আর-একটিও ছানা রইল না।

তখন শিয়ালনী বলল, 'এখন উপায়? কুমির এলে দেখাবে কী? ছানা না দেখতে পেলে তো অমনি আমাদের ধরে খাবে!'

শিয়াল বলল, 'আমাদের পেলে তো ধরে খাবে! নদীর ওপারের বনটা খুব বড়, চল আমরা সেইখানেই যাই। তাহলে কুমির আর আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে না।'

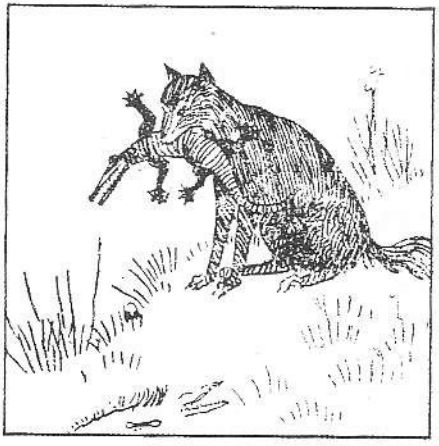

কেমন লাগে কুমির ছানা!

এই বলে শিয়াল শিয়ালনীকে নিয়ে তাদের পুরনো গর্ত ছেড়ে চলে গেল।

এর খানিক বাদেই কুমির এসেছে। সে এসে 'শিয়াল পণ্ডিত, শিয়াল পণ্ডিত' বলে কত ডাকল, কেউ তার কথার উত্তর দিল না। তখন সে গর্তের ভিতর-বার খুঁজে দেখল—শিয়ালও নেই, শিয়ালনীও নেই। খালি তার ছানাদের হাড়গুলো পড়ে আছে।

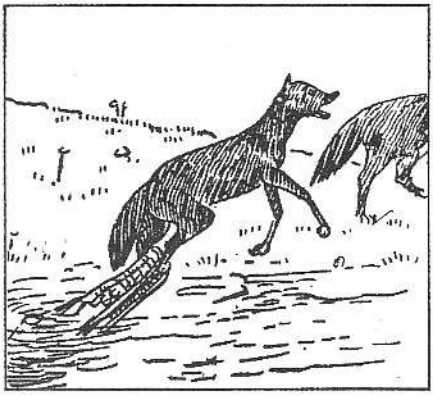

আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে

তখন তার খুব রাগ হল, আর সে চারিদিকে ছুটোছুটি করে শিয়ালকে খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে গিয়ে দেখল, ঐ! শিয়াল আর শিয়ালনী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে।

অমনি 'দাঁড়া হতভাগা!' বলে সে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। জলের নিচে ছুটতে কুমিরের মতো আর কেউ পারে না, দেখতে দেখতে সে গিয়ে শিয়ালের পিছনের একটা পা কামড়ে ধরল।

শিয়াল সবে তার সামনের দু-পা ডাঙায় তুলেছিল, শিয়ালনী তার আগেই উঠে গিয়েছিল। কুমির এসে শিয়ালের পা ধরতেই সে শিয়ালনীকে ডেকে বলল, 'শিয়ালনী, শিয়ালনী, আমার লাঠিগাছা ধরে কে টানাটানি করছে! লাঠিটা বা নিয়েই যায়!'

এ-কথা শুনে কুমির ভাবল, 'তাই তো, পা ধরতে গিয়ে লাঠি ধরে ফেলেছি! শিগগির লাঠি ছেড়ে পা ধরি!'

এই ভেবে যেই সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিয়েছে, অমনি শিয়াল একলাফে ডাঙায় উঠে গিয়েছে। উঠেই বোঁ করে দে-ছুট! তারপর বনের ভিতরে ঢুকে পড়লে আর কার সাধ্য তাকে ধরে!

তারপর থেকে কুমির কেবলই শিয়ালকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু শিয়াল বড্ড চালাক, তাই তাকে ধরতে পারে না। তখন সে অনেক ভেবে এক ফন্দি করল।

কুমির একদিন চড়ায় গিয়ে হাতপা ছড়িয়ে মড়ার মতন পড়ে রইল। তারপর শিয়াল আর শিয়ালনী কচ্ছপ খেতে এসে দেখল, কুমির কেমন হয়ে পড়ে আছে! তখন শিয়ালনী বলল, 'মরে গেছে! চল খাইগে।' শিয়াল বলল, 'রোস, একটু দেখে নিই।' এই বলে সে কুমিরের আর-একটু কাছে

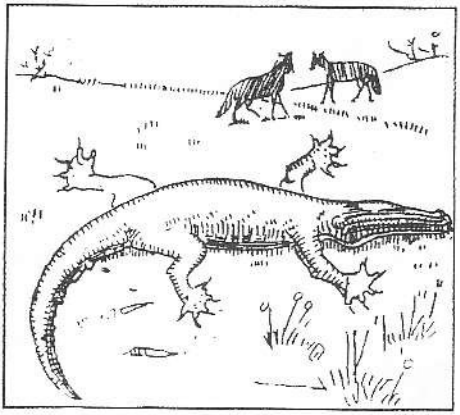

কুমির কেমন হয়ে পড়ে আছে

গিয়ে বলতে লাগল, 'না। এটা দেখছি বড্ড বেশি মরে গেছে! অত বেশি মরাটা আমরা খাই না! যেগুলো একটু-একটু নড়েচড়ে, আমরা সেগুলো খাই!' তা শুনে কুমির ভাবল, 'একটু নড়িচড়ি, নইলে খেতে আসবে না।' এই মনে করে কুমির তার লেজের আগাটুকু নাড়তে লাগল। তা দেখে শিয়াল শিয়ালনীকে বলল, 'ঐ দেখ, লেজ নাড়ছে! তুমি তো বলেছিলে মরে গেছে!' তারপর আর কি তারা সেখানে দাঁড়ায়! তখন কুমির বলল, 'বড্ড ফাঁকি দিলে তো! আচ্ছা, এবারে দেখাব!'

একটা জায়গায় শিয়াল রোজ জল খেতে আসত। কুমির তা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল। ভাবল, শিয়াল জল খেতে এলেই ধরে খাবে।

সেদিন শিয়াল এসে দেখল সেখানে একটাও মাছ নেই। অন্যদিন ঢের মাছ চলাফেরা করে। শিয়াল ভাবল, 'ভালো রে ভালো, আজ সব মাছ গেল কোথায়? বুঝেছি, এখানে কুমির আছে!'

তখন সে বলল, 'এখানকার জলটা বেজায় পরিষ্কার! একটু ঘোলা না হলে কি খাওয়া যায়? চল শিয়ালনী, আরেক জায়গায় যাই।' এ-কথা শুনেই কুমির তাড়াতাড়ি সেখানকার জল ঘোলা করতে আরম্ভ করেছে। তা দেখে শিয়ালও হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়েছে।

আর একদিন শিয়াল এসেছে কাঁকড়া খেতে। কুমির তার আগেই সেখানে চুপ করে বসে আছে। শিয়াল তা টের পেয়ে বলল, 'এখানে কাঁকড়া নেই, থাকলে দু-একটা ভাসত।'

অমনি কুমির তার লেজের আগাটুকু ভাসিয়ে দিল। কাজেই শিয়াল আর জলে নামল না।

এমনি করে বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে গিয়ে, শেষে কুমিরের ভারি লজ্জা হল। তখন সে আর কী করে মুখ দেখাবে! কাজেই সে তার ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে রইল।

সাক্ষী শিয়াল

একজন সওদাগর একটি ঘোড়া নিয়ে বেচতে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার বড্ড ঘুম পেল। তখন সে ঘোড়াটিকে গাছে বেঁধে, সে গাছের তলায় ঘুমিয়ে রইল। এমন সময় এক চোর এসে সওদাগরের ঘোড়াটি নিয়ে চলে যাচ্ছে।

সওদাগর ঘোড়ার পায়ের শব্দে জেগে উঠে বলল, 'কি ভাই, তুমি আমার ঘোড়াটি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?'

চোর তাতে ভারি রাগ করে বলল, 'তোমার ঘোড়া আবার কোন্‌টা হল?'

শুনে সওদাগর আশ্চর্য হয়ে বলল, 'সে কী কথা! তুমি আমার ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছ, আবার বলছ কোন্‌টা আমার ঘোড়া?'

দুষ্টু চোর তখন মুখ ভার করে বলল, 'খবরদার! তুমি আমার ঘোড়াকে তোমার ঘোড়া বলবে না!'

সওদাগর বলল, 'কী? আমি আমার ঘর থেকে ঘোড়াটাকে নিয়ে এলুম, আর তুমি বলছ সেটা তোমার?'

চোর বলল, 'বটে! এটা তো আমার ঐ গাছের ছানা! এক্ষুনি হল। তুমি বুঝেশুনে কথা কও, নইলে বড় মুশকিল হবে!'

তখন সওদাগর গিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল, 'মহারাজ, আমি গাছে আমার ঘোড়াটি বেঁধে ঘুমুচ্ছিলুম, আর ঐ বেটা এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

রাজামশাই চোরকে ডেকে জিগগেস করলেন, 'কিহে, তুমি ওর ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

চোর হাতজোড় করে বলল, 'দোহাই মহারাজ! এটি কখনোই ওর ঘোড়া নয়। এটি আমার গাছের ছানা। ছানাটি হতেই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছিলুম, আর ঐ বেটা উঠে বলছে কিনা ওটা ওর ঘোড়া। সব মিথ্যে কথা!'

শিয়াল ঝিমুতে লাগল

তখন রাজামশাই বললেন, 'এ তো ভারি অন্যায়! গাছের ছানা হল, আর তুমি বলছ সেটা তোমার ঘোড়া! তুমি দেখছি বড় দুষ্টুলোক! পালাও এখান থেকে!' বলে তিনি ঘোড়াটা চোরকেই দিয়ে দিলেন।

সওদাগর বেচারা তখন মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি ফিরে চলল। খানিক দূরে গিয়ে এক শিয়ালের সঙ্গে দেখা হল। শিয়াল তাকে কাঁদতে দেখে বলল, 'কি ভাই? তোমার মুখ এমন ভার দেখছি যে! কী হয়েছে?'

সওদাগর বলল, 'আর ভাই, সে-কথা বলে কী হবে? আমার ঘোড়াটি চোরে নিয়ে গেছে। রাজার কাছে নালিশ করতে গেলুম, সেখানে চোর বলল কিনা ওটা তার গাছের ছানা। রাজামশাই তাই শুনে ঘোড়াটি চোরকে দিয়ে দিয়েছেন।'

এ-কথা শুনে শিয়াল বলল, 'আচ্ছা, এক কাজ করতে পার?'

সওদাগর বলল, 'কী কাজ?'

শিয়াল বলল, 'তুমি আবার রাজামশায়ের কাছে গিয়ে বল, মহারাজ, আমার একজন সাক্ষী আছে। আপনার বাড়িতে যদি কুকুর না থাকে, তবে সেই সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'

তখন সওদাগর আবার রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমার একটি সাক্ষী আছে, কিন্তু আপনার বাড়ির কুকুরদের ভয়ে সে আসতে পারছে না। অনুগ্রহ করে যদি কুকুর তাড়িয়ে দেবার হুকুম দেন, তবে আমার সাক্ষীটিকে নিয়ে আসতে পারি।'

তা শুনে রাজামশাই তখুনি সব কুকুর তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখন তোমার সাক্ষী আসুক।'

এসব কথা সওদাগর শিয়ালকে এসে বলতেই শিয়াল চোখ বুজে টলতে-টলতে রাজার সভায় এল। সেখানে এসেই সে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল। রাজামশাই তা দেখে হাসতে-হাসতে বললেন, 'কে, শিয়াল পণ্ডিত? ঘুমুচ্ছ যে?'

শিয়াল আধচোখে মিটমিট করে তাকিয়ে বলল, 'মহারাজ, কাল সারারাত জেগে মাছ খেয়েছিলুম, তাই আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

রাজা বললেন, 'এত মাছ কোথায় পেলে?'

শিয়াল বলল, 'কাল নদীতে আগুন লেগে সব মাছ এসে ডাঙায় উঠল। আমরা সকলে মিলে সারারাত খেলুম, খেয়ে কি শেষ করতে পারি!' এ-কথা শুনে রাজামশাই এমনি ভয়ানক হাসলেন যে, আর একটু হলেই তিনি ফেটে যেতেন। শেষে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, 'এমন কথা

তো কখনো শুনি নি! জলে আগুন লাগে, এও কি কখনো হয়? এসব পাগলের কথা!'

তখন শিয়াল বলল, 'মহারাজ, ঘোড়া গাছের ছানা হয় এমন কথাও কি কখনো শুনেছেন? সে-কথা যদি পাগলের কথা না হয়, তবে আমার এই কথাটার কী দোষ হল?'

শিয়ালের কথায় রাজামশাই ভারি ভাবনায় পড়লেন।

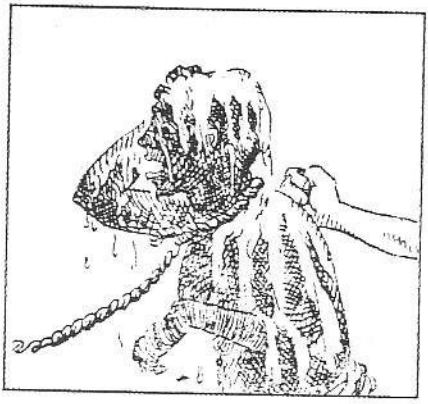

মাথায় ঘোল ঢেলে চোরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে

ভেবেচিন্তে শেষে তিনি বললেন, 'তাই তো! ঠিক বলেছ! গাছের আবার কী করে ছানা হবে? সে বেটা তবে নিশ্চয়ই চোর!'

তখনই হুকুম হল, 'আন্ তো রে সেই চোর বেটাকে বেঁধে!'

অমনি দশ পেয়াদা গিয়ে চোরকে বেঁধে আনল। আনতেই রাজামশাই বললেন, 'মার বেটাকে পঞ্চাশ জুতো!'

বলতে-বলতেই পেয়াদারা তাদের নাগরা জুতো খুলে চটাস-চটাস চোরের পিঠে মারতে লাগল। সে-বেটা পঁচিশ জুতো খেয়েই চেঁচিয়ে বলল, 'গেলুম, গেলুম! আমি ঘোড়া এনে দিচ্ছি! আর এমন কাজ কখনো করব না!' কিন্তু তার কথা আর তখন কে শোনে! পঞ্চাশ জুতো মারা হলে রাজা বললেন, 'শিগগির ঘোড়া এনে দে, নইলে আরো পঞ্চাশ জুতো!'

চোর তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঘোড়া এনে দিল। তারপর তার নিজ হাতে তার নাক-কান মলিয়ে, মাথা চেঁছে, তাতে ঘোল ঢেলে, হতভাগাকে দেশ থেকে দূর করে দেয়া হল। সওদাগর তার ঘোড়া পেয়ে শিয়ালকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

বাঘখেকো শিয়ালের ছানা

এক শিয়াল আর এক শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল, কিন্তু থাকবার জায়গা ছিল না।

তারা ভাবল, 'ছানাগুলোকে এখন কোথায় রাখি? একটা গর্ত না হলে তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে।' তখন তারা অনেক খুঁজে একটা গর্ত বার করল, কিন্তু গর্তের চারধারে দেখল খালি বাঘের পায়ের দাগ। তা দেখে শিয়ালনী বলল, 'ওগো, এটা যে বাঘের গর্ত! এর ভিতরে কী করে থাকবে?'

শিয়াল বলল, 'এত খুঁজেও তো আর গর্ত পাওয়া গেল না। এখানেই থাকতে হবে।'

শিয়ালনী বলল, 'বাঘ যদি আসে তখন কী হবে?'

শিয়াল বলল, 'তখন তুমি খুব করে ছানাগুলির গায়ে চিমটি কাটবে। তাতে তারা চেঁচাবে, আর আমি জিগগেস করব—ওরা কাঁদছে কেন? তখন তুমি বলবে—ওরা বাঘ খেতে চায়।'

তা শুনে শিয়ালনী বলল, 'বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ!' বলেই সে খুব খুশি হয়ে গর্তের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তখন থেকে তারা সেই গর্তের ভিতরেই থাকে।

এমনি করে দিনকতক যায়, শেষে একদিন তারা দেখল যে ঐ বাঘ আসছে। অমনি শিয়ালনী তার ছানাগুলোকে ধরে খুব চিমটি কাটতে লাগল। তখন ছানাগুলি যে চেঁচাল, তা কী বলব!

শিয়াল তখন খুব মোটা আর বিশ্রী গলায় সুর করে জিগগেস করল, 'খোকারা কাঁদছে কেন?'

শিয়ালনী তেমনি বিশ্রী সুরে বলল, 'ওরা বাঘ খেতে চায়, তাই কাঁদছে।'

বাঘ তার গর্তের দিকে আসছিল। এর মধ্যে 'ওরা বাঘ খেতে চায়' শুনে সে থমকে দাঁড়াল। সে ভাবল, 'বাবা! আমার গর্তের ভিতর না-জানি ওগুলো কী ঢুকে রয়েছে! নিশ্চয় ভয়ানক রাক্ষস হবে, নইলে কি ওদের খোকারা বাঘ খেতে চায়?'

তখনি শিয়াল বলল, 'আর বাঘ কোথায় পাব? যা ছিল সবই তো ধরে এনে ওদের খাইয়েছি।'

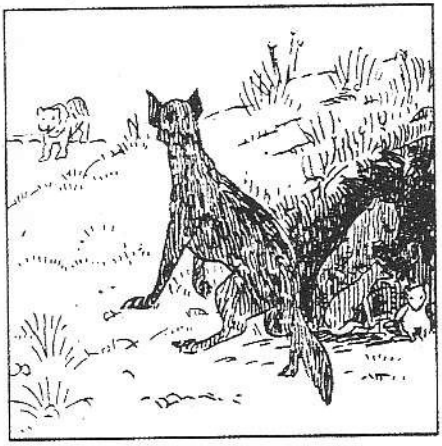

ঐ বাঘ আসছে

তাতে শিয়ালনী বললে, 'তা বললে কী হবে? যেমন করে পার একটা ধরে আনো, নইলে খোকারা থামছে না।' বলে সে ছানাগুলোকে আরো বেশি চিমটি কাটতে লাগল।

তখন শিয়াল বলল, 'আচ্ছা, রোস রোস। ঐ-যে একটা বাঘ আসছে। আমার ঝপাংটা দাও, এখনি ওকে ভতাং করছি।' ঝপাং বলেও কিছু নেই, ভতাং বলেও কিছু নেই—সব শিয়ালের ফাঁকি। বাঘের কিন্তু সেই ঝপাং আর ভতাং শুনেই প্রাণ উড়ে গেল। সে ভাবল, 'মাগো, এই বেলা পালাই, নইলে না-জানি কী দিয়ে কী করবে এসে!' বলে সে আর সেখানে একটুও দাঁড়াল না। শিয়াল চেয়ে দেখল যে, সে লাফে লাফে ঝোপজঙ্গল ডিঙিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তখন শিয়াল আর শিয়ালনী লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যাক, আপদ কেটে গেছে!'

বাঘ তখনো এমনি ছুটেছে যে তেমন আর সে কখনো ছোটে নি।

একটা বানর গাছের উপর থেকে তাকে ছুটতে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে ভাবল, 'তাই তো, বাঘ এমনি করে ছুটছে, এ তো সহজ কথা নয়! নিশ্চয়ই একটা খুব ভয়ানক কিছু হয়েছে!' এই ভেবে সে বাঘকে ডেকে জিগগেস করল, 'বাঘ ভাই, বাঘ ভাই, কী হয়েছে? তুমি যে অমন করে ছুটে পালাচ্ছ?'

বাঘ হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'সাধে কি পালাচ্ছি? নইলে এক্ষুনি আমাকে ধরে খেত!'

বানর বলল, 'তোমাকে ধরে খায় এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো আমি জানি নে। ও কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

বাঘ বলল, 'সেখানে থাকতে বাপু, তবে দেখতুম! দূরে থেকে অমনি করে সকলেই বলতে পারে!'

বানর বলল, 'আমি যদি সেখানে থাকতুম, তবে তোমাকে বুঝিয়ে দিতুম যে সেখানে কিছু নেই। তুমি বোকা, তাই মিছিমিছি অত ভয় পেয়েছ।' এ-কথায় বাঘের ভারি রাগ হল!

সে বলল, 'বটে! আমি বোকা? আর তোমার বুঝি ঢের বুদ্ধি! চল তো একবার সেখানে যাই!'

বানর বলল, 'যাব বইকি, যদি তুমি আমাকে পিঠে করে নিয়ে যাও।'

বাঘ বলল, 'তাই সই! আমার পিঠে বসেই চল!' এই বলে সে বানরকে পিঠে করে আবার গর্তের দিকে ফিরে চলল।

শিয়াল আর শিয়ালনী সবে ছানাদের শান্ত করে একটু বসেছে, আর অমনি দেখে বানরকে পিঠে করে বাঘ আবার আসছে। তখন শিয়ালনী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আবার ছানাগুলোকে চিমটি কাটতে লাগল, ছানাগুলিও ভূতের মতো চ্যাঁচাতে শুরু করল।

বাঘের পিঠে বানর

তখন শিয়াল আবার সেইরকম সুর করে বলল, 'আরে, থাম, থাম! অত চেঁচিও না—অসুখ করবে!'

শিয়ালনী বলল, 'আমি বলছি, যতক্ষণ না একটা বাঘ এনে এদের খেতে দেবে, ততক্ষণ এরা কিছুতেই থামবে না।'

শিয়াল বলল, 'আমি যে ওদের মামাকে বাঘ আনতে পাঠিয়েছি। এখুনি সে বাঘ নিয়ে আসবে, তোমরা থামো।'

তারপর একটু চুপ করেই সে আবার বলল, 'ঐ, ঐ! ঐ যে তোমাদের বাঁদর মামা একটা বাঘ ধরে এনেছে! আর কাঁদিস নে; শিগগির ঝপাংটা দে, ভতাং করি।'

বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল কিন্তু ঝপাং আর ভতাঙের কথা শুনে আর সে বসে থাকতে পারল না। সে একলাফে একটা গাছে উঠে দেখতে-দেখতে কোথায় পালিয়ে গেল।

আর বাঘের কথা কী আর বলব! সে যে সেইখান থেকে ছুট দিল, দুদিনের মধ্যে আর দাঁড়ালই না।

তারপর থেকে আর শিয়ালদের কোনো কষ্ট হয় নি। তারা মনের সুখে সেই গর্তে থেকে দিন কাটাতে লাগল।

আখের ফল

শিয়াল পণ্ডিত আখ খেতে বড় ভালোবাসে, তাই সে রোজ আখ-ক্ষেতে যায়। একদিন সে আখের ক্ষেতে ঢুকে, একটা ভিমরুলের চাক দেখতে পেল। ভিমরুলের চাক সে আগে কখনো দেখে নি, সে মনে করল ওটা বুঝি আখের ফল।

শিয়াল কিনা পণ্ডিত মানুষ, তাই সে আখকে বলে 'ইক্ষু,' ক্ষেতকে বলে 'ক্ষেত্র,' লাঠিকে বলে 'দণ্ড।'

ভিমরুলের চাক দেখে সে বলল, 'আহা ইক্ষুর কী চমৎকার ফল! খেতে না-জানি কতই মিষ্টি হবে।' এই মনে করে যেই সে ভিমরুলের চাক খেতে গিয়েছে, অমনি সব ভিমরুল বেরিয়ে

কী মজাটাই তাকে দেখাতে লাগল। শিয়াল তো প্রাণের ভয়ে খালি ছোটে আর বলে, 'ইক্ষুর ক্ষেত্রে আর যাব না!'

খানিক বাদে ভিমরুলগুলো তাকে ছেড়ে গেল। তখন সে ভাবল, 'ক্ষেত্রে তো রোজ যাই তাতে তো কিছু হয় না! ফল খেতে গিয়েই আমার বিপদ হল! তবে আর ক্ষেত্রে যাব না কেন? ফল না খেলেই হল।' এই ভেবে সে বলতে লাগল, 'যদি ইক্ষুর ক্ষেত্রে যাব, ইক্ষুর ফল আর না খাব!' দুদিন সে খালি এই কথাই বলল। তারপর যখন বেদনা একটু কমে এল তখন সে ভাবল, 'ঐ ফলটার ভিতরে পোকা ছিল, তারাই আমাকে কামড়েছে। আগে যদি ফলটাতে নাড়া দিতুম তবে পোকাগুলি বেরিয়ে যেত। তারপর ফল খেতে কোনো কষ্ট হত না। আহা সে ফল খেতে না জানি কতই মিষ্টি! তবে আর ফল খাব না কেন। খাবার আগে পোকা তাড়িয়ে দিলেই হবে।' এই ভেবে সে বলতে লাগল, 'যদি ইক্ষুর ফল খাব, আগে দণ্ড দিয়ে নাড়া দিব!' বলতে বলতে আখের ক্ষেতে গিয়ে সে তো লাঠি দিয়ে নাড়া দিয়েছে। অমনি আর যাবে কোথায়! ভিমরুলের দল এসে তাকে কামড়িয়ে আধমরা করে তবে ছাড়ল। সেই থেকে সে আর ইক্ষুর ফল খেত না।

ইক্ষুর ক্ষেতে আর যাব না

হাতির ভিতরে শিয়াল

রাজার যে হাতিটা তাঁর আর সকল হাতির চেয়ে ভালো আর বড়, আর দেখতে সুন্দর, সেইটে তাঁর 'পাটহস্তী'। সেই হাতিতে চড়ে রাজামশাই চলাফেরা করেন, আর তাকে খুব ভালোবাসেন।

একদিন রাজার পাটহস্তী মরে গেল। রাজা অনেকক্ষণ ভারি দুঃখ করলেন, শেষে বললেন, 'ওটাকে ফেলে দিয়ে এস।'

তখন সেই হাতির পায়ে বড়-বড় দড়ি বেঁধে পাঁচশো লোক টেনে তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে এল।

সেই মাঠের কাছে এক শিয়াল থাকত। সে অনেক দিন পেট ভরে খেতে পায় নি। মাঠে মরা হাতি দেখতে পেয়ে সে খুব খুশি হয়ে এসে তাকে খেতে আরম্ভ করল। তার এতই খিদে হয়েছিল যে, খেতে-খেতে সে হাতির পেটের ভিতরে ঢুকে গেল, তবুও তার খাওয়া শেষ হল না। এমনি করে দুদিন চলে গেল, তখনো সে হাতির পেটের ভিতরে বসে কেবল খাচ্ছেই। ততদিন রোদ লেগে চামড়া শুকিয়ে, হাতির পেটের ফুটো ছোট হয়ে গেছে, আর শিয়ালও অনেক খেয়ে মোটা হয়ে গেছে। তখন তো তার ভারি মুশকিল হল। সে অনেক চেষ্টা করেও হাতির পেটের ভিতর থেকে বেরুতে পারল না। এখন উপায় কী হবে?

এমন সময় তিনজন চাষি সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখতে পেয়েই শিয়ালের মাথায় এক ফন্দি জোগাল। সে হাতির পেটের ভিতর থেকে তাদের ডেকে বলল, 'ওহে ভাইসকল, তোমরা রাজার কাছে একটা খবর দিতে পারবে? আমার পেটে যদি পঞ্চাশ কলসি ঘি মাখানো হয়, তবে আমি আবার উঠে দাঁড়াব।

চাষিরা তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে বলল, 'শোন শোন, হাতি কী বলছে! চল আমরা রাজামশাইকে খবর দিই গে।' তারা তখুনি রাজার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'রাজামশাই, আপনার সেই মরা হাতি বলছে যে তার পেটে পঞ্চাশ কলসি ঘি মাখালে সে আবার উঠে দাঁড়াবে। শিগগির পঞ্চাশ কলসি ঘি পাঠিয়ে দিন।'

ঘি-টি ফেলে সবাই পালাচ্ছে

এ-কথায় রাজামশাই যে কী খুশি হলেন, কী বলব! তিনি বললেন, 'আমার হাতি যদি বাঁচে, পঞ্চাশ কলসি ঘি আর কত বড় একটা কথা! হাজার কলসি ঘি নিয়ে তার পেটে মাখাও!'

তখুনি হাজার মুটে হাজার কলসি ঘি নিয়ে মাঠে উপস্থিত করল। দু-হাজার লোক মিলে সেই ঘি হাতির পেটে মাখাতে লাগল। সাতদিন খালি 'আনো ঘি,' 'ঢালো ঘি' ছাড়া সেখানে আর কোনো কথাই শোনা গেল না।

সাতদিনের পরে শিয়াল দেখল যে, হাতির চামড়াও ঢের নরম হয়েছে, পেটের ফুটোও ঢের বড় হয়েছে; এখন সে ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে আসতে পারে। তখন সে সকলকে ডেকে বলল, 'ভাইসকল, এইবার আমি উঠব। তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, নইলে যদি আমি মাথা ঘুরে তোমাদের উপরে পড়ে-টড়ে যাই!'

তখন ভারি একটা গোলমাল হল। যে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধাক্কা মেরে বলছে, 'আরে বেটা শিগগির সর! হাতি উঠছে, ঘাড়ে পড়বে!'

এ-কথা শুনে কি কেউ আর সেখানে দাঁড়ায়? ঘি-টি সব ফেলে তারা ছুটে পালাতে লাগল, একবার চেয়েও দেখল না, হাতি উঠেছে কি পড়েই আছে। তা দেখে শিয়াল ভাবল, 'এই বেলা পালাই!' তখন সে তাড়াতাড়ি হাতির পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে দে-ছুট!

মজন্তালী সরকার

এক গ্রামে দুটো বিড়াল ছিল। তার একটা থাকত গোয়ালাদের বাড়িতে—সে খেত দই, দুধ, ছানা, মাখন আর সর। আর একটা থাকত জেলেদের বাড়িতে—সে খেত খালি ঠেঙার বাড়ি আর লাথি। গোয়ালাদের বিড়ালটা খুব মোটা ছিল, আর সে বুক ফুলিয়ে চলত। জেলেদের বিড়ালটার গায়ে খালি চামড়া আর হাড় কখানি ছিল। সে চলতে গেলেই টলত আর ভাবত কেমন করে গোয়ালাদের বিড়ালের মতো মোটা হবে।

শেষে একদিন সে গোয়ালাদের বিড়ালকে বলল, 'ভাই, আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।'

সব কিন্তু মিছে কথা। নিজেই খেতে পায় না, সে আবার নিমন্ত্রণ খাওয়াবে কোথা থেকে? সে ভেবেছে, 'গোয়ালাদের বিড়াল আমাদের বাড়ি এলেই আমার মতন ঠেঙা খাবে আর মরে যাবে, তারপর আমি গোয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে থাকব!'

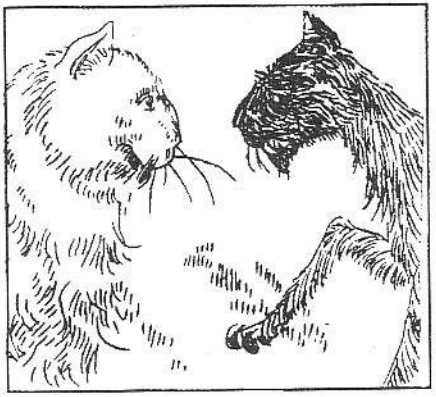

'আজ আমার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ'

যে কথা সেই কাজ। গোয়ালাদের বিড়াল জেলেদের বাড়িতে আসতেই জেলেরা বলল, 'ঐ রে! গোয়ালাদের সেই দই-দুধখেকো চোর বিড়ালটা এসেছে, আমাদের মাছ খেয়ে শেষ করবে। মার বেটাকে!'

বলে তারা তাকে এমনি ঠেঙান ঠেঙালে যে, বেচারা তাতে মরেই গেল। রোগা বিড়াল তো জানতই যে এমনি হবে। সে তার আগেই গোয়ালাদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে খুব করে ক্ষীর-সর খেয়ে, দেখতে-দেখতে সে মোটা হয়ে গেল। তখন আর সে অন্য বিড়ালদের সঙ্গে কথা কয় না; আর নাম জিগগেস করল বলে, 'মজন্তালী সরকার।'

একদিন মজন্তালী সরকার কাগজকলম নিয়ে বেড়াতে বেরুল। বেড়াতে-বেড়াতে সে বনের ভিতর গিয়ে দেখল যে তিনটে বাঘের ছানা খেলা করছে। সে তাদের তিন তাড়া লাগিয়ে বলল, 'এইয়ো! খাজনা দে!' বাঘের ছানাগুলো তার কাগজকলম দেখে আর ধমক খেয়ে বড্ড ভয় পেল। তাই তারা তাড়াতাড়ি তাদের মা-র কাছে গিয়ে বলল, 'ও মা, শিগগির এস! দেখ এটা কী এসেছে, আর কী বলছে!'

বাঘিনী তাদের কথা শুনে এসে বলল, 'তুমি কে বাছা? কোত্থেকে এলে? কী চাও?'

মজন্তালী বলল, 'আমি রাজার বাড়ির সরকার, আমার নাম মজন্তালী। তোরা যে আমাদের রাজার জায়গায় থাকিস, তার খাজনা কই? খাজনা দে!'

বাঘিনী বলল, 'খাজনা কাকে বলে তা তো আমি জানি নে! আমরা খালি বনে থাকি, আর কেউ এলে তাকে ধরে খাই। তুমি না হয় একটু বস, বাঘ আসুক।'

তখন মজন্তালী একটা উঁচু গাছের তলায় বসে, চারিদিকে উঁকি মেরে দেখতে

মজন্তালী সরকার

লাগল। খানিক বাদেই সে দেখল—ঐ বাঘ আসছে। তখন সে তাড়াতাড়ি কাগজকলম রেখে, একেবারে গাছের আগায় গিয়ে উঠল।

বাঘ আসতেই তো বাঘিনী তার কাছে সব কথা বলে দিয়েছে, আর বাঘের যে কী রাগ হয়েছে কী বলব! সে ভয়ানক গর্জন করে বলল, 'কোথায় সে হতভাগা? এখুনি তার ঘাড় ভাঙছি!'

মজন্তালী গাছের আগা থেকে বলল, 'কি রে বাঘা, খাজনা দিবি না? আয়, আয়!'

মজন্তালী বাঘ মেরেছে

শুনেই তো বাঘ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে, 'হাল্লুম!' বলে দুই লাফে সেই গাছে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু খালি উঠলে কি হয়? মজন্তালীকে ধরতে পারলে তো! সে একটুখানি, হালকা জন্তু, সেই কোন্ সরু ডালে উঠে বসেছে, অতবড় ভারী বাঘ সেখানে যেতেই পারছে না। না-পেরে রেগেমেগে বেটা দিয়েছে এক লাফ, অমনি পা হড়কে গিয়েছে পড়ে। পড়তে গিয়ে, দুই ডালের মাঝখানে মাথা আটকে তার ঘাড় ভেঙে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

তা দেখে মজন্তালী ছুটে এসে তার নাকে তিন-চারটে আঁচড় দিয়ে, বাঘিনীকে ডেকে বলল, 'এই দেখ, কী করেছি! আমার সামনে বেয়াদবি!'

এসব দেখেশুনে তো বাঘিনী বেচারির প্রাণ উড়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল, 'দোহাই মজন্তালীমশাই, আমাদের প্রাণে মারবেন না! আমরা আপনার চাকর হয়ে থাকব!'

তাতে মজন্তালী বলল, 'আচ্ছা তবে থাক্, ভালো করে কাজকর্ম করিস, আর আমাকে খুব ভালো খেতে দিস।'

সেই থেকে মজন্তালী বাঘিনীদের বাড়িতেই থাকে। খুব করে খায়, আর বাঘিনীর ছানাগুলির ঘাড়ে চড়ে বেড়ায়। সে বেচারারা তার ভয়ে একেবারে জড়সড় হয়ে থাকে, আর তাকে মনে করে, না-জানি কত বড় লোক।

একদিন বাঘিনী তাকে হাতজোড় করে বলল, 'মজন্তালীমশাই, এ বনে খালি ছোট-ছোট জানোয়ার, এতে কিছু আপনার পেট ভরে না। নদীর ওপারে খুব ভারী বন আছে, তাতে খুব বড়-বড় জানোয়ারও থাকে। চলুন, সেইখানেই যাই।'

শুনে মজন্তালী বলল, 'ঠিক কথা! চল ওপারেই যাই।' তখন বাঘিনী তার ছানাদের নিয়ে, দেখতে-দেখতে নদীর ওপারে চলে গেল। কিন্তু মজন্তালী কই? বাঘিনী আর তার ছানারা অনেক খুঁজে দেখল—ঐ মজন্তালী সরকার নদীর মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। স্রোতে তাকে ভাসিয়ে সেই কোথায় নিয়ে গিয়েছে, আর ঢেউয়ের তাড়ায় তার প্রাণ যায়-যায় হয়েছে।

মজন্তালী তো ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, আর দুটো ঢেউ এলেই সে মারা যাবে। এমন সময় ভাগ্যিস বাঘিনীর একটা ছানা তাড়াতাড়ি তাকে ডাঙায় তুলে এনে বাঁচাল, নইলে সে মরেই যেত, তাতে আর ভুল কী?

কিন্তু মজন্তালী সরকার তাদের সে-কথা জানতেই দিল না। সে ডাঙায় উঠেই ভয়ানক চোখ রাঙিয়ে বাঘের ছানাকে চড় মারতে গেল, আর গাল যে কত দিল তার তো লেখাজোখাই নেই। শেষে বলল, 'হতভাগা মূর্খ, দেখ দেখি কী করলি! আমি অমন চমৎকার হিসাবটা করছিলুম, সেটা শেষ না হতেই তুই আমাকে টেনে তুলে আনলি—আর আমার সব হিসেব এলিয়ে গেল! আমি সবে গুণছিলুম নদীতে কটা ঢেউ, কতগুলো মাছ আর কতখানি জল আছে। মূর্খ বেটা, তুই এর মধ্যে গিয়ে সব গোলমাল করে দিলি! এখন যদি আমি রাজামশাইয়ের কাছে গিয়ে এর হিসেব দিতে না পারি, তবে মজাটা টের পাবি!'

হাসতে হাসতে পেট ফেটে গেছে

এ-সব কথা শুনে বাঘিনী হাতজোড় করে বলল, 'মজন্তালীমশাই, ঘাট হয়েছে, এবার মাপ করুন! ওটা মূর্খ, লেখাপড়া জানে না, তাই কী করতে কী করে ফেলেছে।'

মজন্তালী বলল, 'আচ্ছা, এবারে মাপ করলুম। খবরদার! আর যেন কখনো এমন হয় না!' এই বলে মজন্তালী তার ভিজে গা শুকাবার জন্যে রোদ খুঁজতে লাগল।

ভারী বনের ভিতরে সহজে রোদ ঢুকতে পায় না। সেখানে রোদ খুঁজতে গেলে উঁচু গাছের আগায় গিয়ে উঠতে হয়। মজন্তালী একটা গাছের আগায় উঠে দেখল যে, এই বড় এক মরা মহিষ মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। তখন সে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মহিষটার গায় কয়েকটা আঁচড়-কামড় দিয়ে এসে বাঘিনীকে বলল, 'শিগগির যা, আমি একটা মোষ মেরে রেখে এসেছি!'

বাঘিনী আর তার ছানাগুলো ছুটে গিয়ে দেখল, সত্যি মস্ত এক মোষ পড়ে আছে। তারা চারজনে মিলে অনেক কষ্টে সেটাকে টেনে আনল, আর ভাবল, 'ইশ্! মজন্তালীমশাইয়ের গায়ে কী ভয়ানক জোর!'

আর-একদিন তারা মজন্তালীকে বলল, 'মজন্তালীমশাই, এ বনে অনেক বড়-বড় হাতি আর গণ্ডার আছে। চলুন একদিন সেইগুলো মারতে যাই।'

এ-কথা শুনে মজন্তালী বলল, 'তাই তো, হাতি-গণ্ডার মারব না তো মারব কী? চল আজই যাই!'

বলে সে তখুনি সকলকে নিয়ে হাতি আর গণ্ডার মারতে চলল। যেতে যেতে বাঘিনী তাকে জিগগেস করল, 'মজন্তালীমশাই, আপনি খাপে থাকবেন, না ঝাঁপে থাকবেন?' খাপে থাকবার মানে কী? না—জন্তু এলে তাকে ধরে মারবার জন্যে চুপ করে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা। আর ঝাঁপে থাকার মানে হচ্ছে, বনের ভিতরে গিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে জন্তু তাড়িয়ে আনা।

মজন্তালী ভাবল, 'আমার তাড়ায় আর কোনো জন্তু ভয় পাবে?' তাই সে বলল, 'আমি ঝাঁপিয়ে যেসব পশু পাঠাব, তা কি তোরা মারতে পারিস? তোরা ঝাঁপে যা, আমি খাপে থাকি।'

বাঘিনী বলল, 'তাই তো, সেসব ভয়ানক জন্তু কি আমরা মারতে পারব? চল্ বাছারা, আমরা ঝাঁপে যাই।'

এই বলে বাঘিনী তার ছানাগুলোকে নিয়ে বনের অন্যধারে গিয়ে, ভয়ানক 'হাল্লুম-হাল্লুম' করে জানোয়ারদের তাড়াতে লাগল। মজন্তালী জানোয়ারদের ডাক শুনে একটা গাছের তলায় বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

খানিক বাদে একটা সজারু সড়সড় করে সেইদিক পানে ছুটে এসেছে, আর মজন্তালী তাকে দেখে 'মাগো' বলে সেই গাছের একটা শিকড়ের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে। এমন সময় একটা হাতি সেইখান দিয়ে চলে গেল। সেই হাতির একটা পায়ের একপাশ সেই শিকড়ের উপরে পড়েছিল, তাতেই মজন্তালীর পেট ফেটে গিয়ে, বেচারার প্রাণ যায় আর কী!

অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে বাঘেরা ভাবল, 'মজন্তালীমশাই না-জানি এতক্ষণে কত জন্তু মেরেছেন, চল্ একবার দেখে আসি।'

তারা এসে মজন্তালীর দশা দেখে বলল, 'হায়-হায়! মজন্তালীমশায়ের এ কী হল?'

মজন্তালী বলল, 'আর কী হবে? তোরা যেসব ছোট-ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি! দেখে হাসতে-হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে!'

এই বলে মজন্তালী মরে গেল।

পিঁপড়ে আর হাতি আর বামুনের চাকর

এক পিঁপড়ে ছিল আর তার পিঁপড়ী ছিল, আর তাদের দুজনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল।

একদিন পিঁপড়ী বলল, 'দেখ পিঁপড়ে, আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু তুমি আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ে, ফেলবে তো?'

পিঁপড়ে বলল, 'হ্যাঁ পিঁপড়ী, অবশ্যি ফেলব। আর আমি যদি তোমার আগে মরি, তবে কিন্তু আমাকে গঙ্গায় নিয়ে ফেলবে। কেমন পিঁপড়ী, ফেলবে তো?'

পিঁপড়ী বলল, 'তা আর বলতে, অবশ্যি ফেলব।'

এমনি দুজনে কথাবার্তা হয়েছে, তারপর একদিন পিঁপড়ী মরে গেল। তখন পিঁপড়ে অনেক কাঁদল, তারপর ভাবল, 'এখন পিঁপড়ীকে তো নিয়ে গঙ্গায় ফেলতে হয়।'

এই ভেবে সে পিঁপড়ীকে কাঁধে করে নিয়ে গঙ্গায় চলল।

সেখান থেকে গঙ্গা অনেক দূরে, যেতে অনেক দিন লাগে। পিঁপড়ে পিঁপড়ীকে নিয়ে সমস্ত দিন চলল। তারপর যখন সন্ধে হল, তখন সে দেখল যে সে রাজার হাতিশালে এসেছে—সেই যেখানে তাঁর সব হাতি থাকে। পিঁপড়ের বড্ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই সে পিঁপড়ীকে নিয়ে সেইখানে বিশ্রাম করতে লাগল। সেইখানে মস্ত একটা হাতি বাঁধা ছিল, সেটা রাজার পাটহস্তী। হাতিটা শুঁড় নাড়ছিল, আর ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছিল, আর তাতে পিঁপড়ীকে সুদ্ধ পিঁপড়েকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই পিঁপড়ে রেগে বলল, 'খবরদার!' হাতি কিন্তু তা শুনতে পেল না। সে আবার নিশ্বাস ফেললে, আবার তাতে পিঁপড়েকে উড়িয়ে নিল। তাই পিঁপড়ে আরো রেগে খুব চেঁচিয়ে বলল, 'এইয়ো! খবরদার! ভালো হবে না কিন্তু! হতভাগা, পাজি!'

হাতি ভাবল, 'ভালো রে ভালো, ওখান থেকে কে আমায় চিঁ-চিঁ করে গাল দিচ্ছে? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!' এই বলে সে তার পা দিয়ে সেই জায়গাটা ঘষে দিল।

পিঁপড়ের তো এখন ভারি বিপদ। সে ভাবল, 'মাগো, এই বুঝি পিষে গেলুম!' কিন্তু তারপরেই সে দেখল যে সে পিষে যায় নি, হাতির পায়ের তলায় যে ছোট-ছোট গর্ত থাকে তারই একটায় ঢুকে সে বেঁচে গিয়েছে, আর পিঁপড়ীকেও ছাড়ে নি।

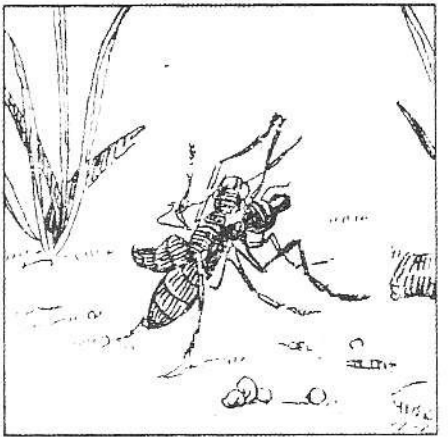

পিঁপড়েকে কাঁধে করে নিয়ে গঙ্গায় চলল

তখন আর তার আনন্দ দেখে কে? সেই গর্তের ভিতরে বসে সে হাতির পায়ের মাংস খুঁড়ে খেতে লাগল। যতক্ষণ না সে পিঁপড়ীকে নিয়ে একেবারে হাতির মাথার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল ততক্ষণে সে খুঁড়তে ছাড়ে নি।

হাতির কিন্তু তাতে ভারি অসুখ হল। সে খালি মাথা নাড়ে, আর চেঁচায়, আর পাগলের মতন ছুটোছুটি করে। সকলে বলল, 'হায়-হায়! হাতির কী হল?' তারা কেউ জানে না যে, হাতির মাথায় পিঁপড়ে ঢুকেছে। যদি জানত, আর হাতির পায়ের তলায় খুব করে চিনি মাখাত, তাহলে সেই চিনির গন্ধে পিঁপড়ে তখনি বেরিয়ে আসত। কিন্তু তারা তো আর তা জানে না! তারা বদ্যি ডাকল, ওষুধ খাওয়াল, আর তাতে হাতি মরে গেল।

সেদিন রাত্রে রাজামশাই স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর হাতি যেন এসে তাঁকে বলছে, 'মহারাজ, তোমার জন্যে আমি অনেক খেটেছি, আমাকে নিয়ে গঙ্গায় ফেলবে।'

সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজামশাই হুকুম দিলেন, 'আমার হাতিকে নিয়ে গঙ্গায় ফেলতে হবে।'

তখুনি দু-তিনশো লোক সেই হাতির পায় মোটা দড়ি বেঁধে, তাকে 'হেঁইয়ো! হেঁইয়ো!' করে টেনে নিয়ে গঙ্গায় চলল। ভয়ানক বড় হাতি, তাকে টানা ভারি মুশকিল। সেই লোকগুলি তাকে নিয়ে খানিক দূরে যায়, আর দড়ি ছেড়ে দিয়ে বসে হাঁপায়।

এমন সময় হয়েছে কী—সেইখান দিয়ে এক বামুনঠাকুর যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে এক চাকর। সেই লোকগুলিকে বসে হাঁপাতে দেখে সেই চাকরটা বলল, 'ইঁদুরের মতো একটা হাতি, তাকে টানতে গিয়ে তিনশো লোক হাঁপাচ্ছে! আমি হলে ওটাকে একলাই নিয়ে যেতে পারি!'

এ-কথা শুনেই তো সেই তিনশো লোক লাফিয়ে উঠল। তারা বলল, 'কী, এতবড় কথা! আমরা তিনশো লোকে যা পারছি নে, তুই একলাই তা করতে পারবি? আচ্ছা, এর বিচার না হলে তো আমরা আর হাতি টানছি না! চল্ বেটা, রাজার কাছে চল্, দেখব তুই কেমন জোয়ান!'

তাতে সেই চাকর বলল, 'আচ্ছা, চল্ না! আমি কি তোদের মতো জোয়ান?'

তখন মাঠে হাতি ফেলে রেখে তারা সকলে রাজার কাছে এসে বলল, 'দোহাই রাজামশাই, এর বিচার হয়! আমরা তিনশো লোক আপনার হাতি টেনে হাঁপিয়ে গেলুম, আর এই বেটা

বলছে কিনা সে একলাই সেটা নিয়ে যেতে পারে। এর বিচার না হলে আমরা আর আপনার হাতি ছোঁব না।'

এ-কথা শুনে রাজামশাই বামুনের চাকরকে বলল, 'কিরে, সত্যি কি তুই ঐ হাতিকে একলা নিয়ে যেতে পারিস?'

বামুনের চাকরের কাঁধে পুঁটুলি

চাকর জোড়হাতে নমস্কার করে বলল, 'মহারাজের যদি হুকুম হয়, তবে পারি বৈকি। কিন্তু আগে আমাকে পেট ভরে চারটি খেতে দিতে হবে।'

রাজা বললেন, 'দাও তো ওকে একসের চাল আর ডাল তরকারি। আগে পেট ভরে খেয়ে নিক, তারপর হাতি নিয়ে যেতে হবে।'

তাতে সে চাকর হেসে বলল, 'মহারাজ, একসের চাল তো ঝাড়ুঅলারা খায়—তাতে কি হাতি টানা চলে?'

রাজা বললেন, 'তবে তুই কী চাস?'

চাকর বলল, 'মহারাজ, বেশি আর কী চাইব?—এই মণ-দুই চাল, দুটো খাসি আর একমণ দই হলেই চলবে।'

রাজা বললেন, 'আচ্ছা তাই পাবি, কিন্তু খেতে হবে সব।'

চাকর বলল, 'যে আজ্ঞে, মহারাজ!'

বামুনের চাকর সেই দু-মণ চালের ভাত আর দুটো খাসি আর একমণ দই দিয়ে পেট ভরে খেয়ে তো আগে খুব একচোট ঘুমিয়ে নিল। তারপর নিজের গামছাখানি দিয়ে সেই হাতিটাকে জড়িয়ে, বেশ করে একটি পুঁটুলি বাঁধল। তারপর পুঁটুলিটিকে লাঠির আগায় ঝুলিয়ে, সেই লাঠিসুদ্ধ সেই পুঁটুলি কাঁধে ফেলল। তারপর গণ্ডা-দশেক পান মুখে গুঁজে গান গাইতে-গাইতে গঙ্গায় চলল। তা দেখে রাজামশাই হাঁ করে রইলেন, আর সেই তিনশো লোক হাঁ করে রইল, আর সকলে ছুটে বাড়িতে খবর দিতে গেল!

ততক্ষণে সে চাকর অনেক দূরে চলে গিয়েছে, আর খুব চনচনে রোদ উঠেছে। আরো অনেক দূর গিয়ে চাকর বলল, 'উহ্! কী ভয়ানক রোদ! আমার গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেতে পেলে হত।'

বলতে-বলতেই সে দেখল যে খানিক দূরে একটি পুকুর রয়েছে, সেই পুকুরের ধারে গাছপালার আড়ালে একটি কুঁড়েঘর। চাকরটি পুকুরের ধারে পুঁটুলিটিকে রেখে সেই ঘরের কাছে গিয়ে দেখল যে, সেখানে একটি ছোট মেয়ে বসে আছে। সে সেই মেয়েটিকে বলল, 'বাছা, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেতে দেবে?'

মেয়েটি বলল, 'মোটে এক জালা জল আছে। তোমাকে যদি দিই, তবে বাবা মাঠ থেকে এসে কী খাবেন?'

এ-কথা শুনে চাকর রেগে বলল, 'বটে! তুই একটু জল খেতে দিবিনে? আচ্ছা, দেখি এরপর তোরা কোত্থেকে জল খাস!'

এই বলে সে সেই পুকুরে নেমে, চোঁ-চোঁ করে তার জল খেতে লাগল। যতক্ষণ সেই পুকুরে জল ছিল, ততক্ষণ খালি চোঁ-চোঁ শব্দ শোনা গিয়েছিল! দেখতে-দেখতে সে সেই এক পুকুর জল খেয়ে শেষ করল! জল খেতে-খেতে তার পেটটা ফুলে আগে ঢাকের মতো হল, তারপর হাতির মতো হল, শেষে একেবারে পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। এমনি করে পুকুরের সব জল খেয়ে বামুনের চাকর দেখল যে, সে জল আর কিছুতেই তার পেটে থাকতে চাচ্ছে না। তখন সে আর কী করবে, তাড়াতাড়ি একটা বটগাছ গিলে ফেলল। সেই বটগাছ তার গলার মাঝামাঝি গিয়ে ছিপির মতো আটকে রইল—জল আর বেরুতে পারল না।

তারপর বামুনের চাকর খুব খুশি হয়ে সেই পুকুরের ধারে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল। তার পেটটা তালগাছের চেয়েও উঁচু হয়ে উঠল, যেন একটা পাহাড়! সেই মেয়েটির বাপ তখন মাঠে কাজ করছিল। সে সেই পাহাড়ের মতো পেট দেখে ভাবল, "বাবা! না-জানি ওটা কী!' বলে সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটে এল।

সে বাড়িতে আসতেই তার মেয়ে বলল, 'বাবা, বাবা, দেখ কী দুষ্টুলোক! আমার কাছে জল চেয়েছিল। ঘরে এক জালা বই জল নেই, ওকে দিলে তুমি এসে কী খাবে? তাই আমি জল দিই নি বলে আমাদের পুকুরের সব জল খেয়ে ফেলেছে!'

বলতে-বলতে তারা দুজনে সেই চাকরের কাছে এল। সেখানে এলে সে মেয়েটি ভয়ানক নাক সিঁটকিয়ে বলল, 'উহ্ হুহু! কী গন্ধ! দেখ বাবা, একটা পচা ইঁদুর না কী পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছে!'

এই বলে সে একহাতে নাকে কাপড় দিয়ে, আর-এক হাতের দু-আঙুলে সেই হাতিসুদ্ধ পুঁটুলিটা ছুড়ে ফেলে দিল। সে পুঁটুলি পড়ল গিয়ে একেবারে সেই গঙ্গায়।

আর মেয়ের বাপ করেছে কী, কষে কোমর বেঁধে মুখ খামাটি করে মেরেছে বামুনের চাকরের পেটে এক লাথি। সে কি যেমন-তেমন লাথি! লাথির চোটে, সেই বটগাছের ছিপিসুদ্ধ তার পেটের সব জল বেরিয়ে ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, মেয়ে-টেয়ে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাকি রইল খালি মেয়ের বাপ আর বামুনের চাকর। তখন তারা দুজনে মিলে কোলাকুলি করতে লাগল।

কোলাকুলি শেষ হলে সেই মেয়ের বাপ বলল, 'আরে ভাই, তোর মতন জোয়ান তো আর কোথাও দেখি নি! এক পুকুর জল খেয়ে সব শেষ করলি!'

বামুনের চাকর বলল, 'ভাই, তোর মতন জোয়ানও তো আমি আর কোথাও দেখি নি! এক লাথিতে আমার পেট হালকা করে দিলি!'

এই কথা নিয়ে তখন তাদের মধ্যে ভারি তর্ক আরম্ভ হল। এ বলে তুই বেশি জোয়ান, ও বলে তুই বেশি জোয়ান। এখন কার কথা ঠিক, তা কে বলবে!

অনেক তর্ক করে তারা এই ঠিক করল, 'চল, একটা খুব বড় বাজারে গিয়ে দুজনে কুস্তি লড়ি, তাহলেই দেখা যাবে কে বেশি জোয়ান!'

এই বলে তারা দুজন কুস্তি লড়তে বাজারে চলেছে, এমন সময় এক মেছুনির সঙ্গে তাদের দেখা হল। মেছুনি ঝুড়িতে করে মাছ নিয়ে বাজারে বেচতে যাচ্ছিল। তাদের দুজনকে দেখে জিগগেস করল, 'হ্যাঁ গা, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

www.alorpathsala.org

তারা বলল, 'বাজারে যাচ্ছি, কুস্তি লড়তে।'

তা শুনে মেছুনি বলল, 'বাজার তো ঢের দূর বাছা, এত কষ্ট করে তোরা সেখানে যাবি কী করতে? তারচেয়ে আমার ঝুড়ির ভিতর এসে কুস্তি কর্। কুস্তি করতে-করতে যার দিকে ঝুড়ি ঝুঁকে পড়বে, আমি জানব তারই হার হয়েছে।'

শুনে তারা দুজনে বলল, 'বাহ্ বেশ কথা! কুস্তিও করতে পাব, হাঁটতেও হবে না।'

এই বলে তারা মেছুনির ঝুড়িতে ঢুকে কুস্তি আরম্ভ করল, আর মেছুনি সেই ঝুড়ি মাথায় করে বাজারে চলল।

এমন সময় এক কাণ্ড হয়েছে। সেই দেশে এক সর্বনেশে চিল থাকত। সে গরু, মহিষ, হাতি, ঘোড়া, যা পেত তাই ধরে গিলত। খালি সেই মেছুনির কাছে সে জব্দ ছিল। মেছুনির ঝুড়ি ধরতে এলেই মেছুনি তাকে এমনি বকুনি দিত যে, সে পালাবার পথ পেত না। কিন্তু তাতে তার রাগ আরও বেড়ে যেত; আর সে ভাবত যে, যেমন করেই হোক একদিন ঐ ঝুড়িটা কেড়ে নিতে হবে।

রাজার মেয়ের চোখে কী পড়েছে

সেদিনও সেই চিল খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে, দূর থেকে তার পাখার শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক গোয়ালা সাতশো মোষ মাঠে চরাতে এসেছিল। সে সেই শব্দ শুনে ভাবল, 'সর্বনাশ! ঐ সেই চিল আসছে, আমার মোষ খেয়ে ফেলবে! এখন কী করি?'

এই ভেবে সেই সাতশো মোষ ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে, ভোঁ-ভোঁ করে বাড়ির পানে ছুটল।

বাড়ির লোক জিগগেস করল, 'কী হয়েছে? অত যে ছুটে এলে?' সে বলল, 'ছুটব না! চিল আসছে যে, আমার মোষ খেয়ে ফেলবে!' তারা বলল, 'তবে মোষ কোথায় রেখে এলে?'

সে বলল, 'রেখে আসব কেন? সঙ্গে এনেছি।'

তারা বলল, 'তবে কই মোষ?'

সে বলল, 'এই দেখ না।'

বলে সে ট্যাঁক খুলে দিল, আর সাতশো মোষ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল!

তা দেখে তারা খুব খুশি হয়ে বলল, 'ভাগ্যিস তুমি ট্যাঁকে করে নিয়ে এসেছিলে, নইলে আজ সব মোষ খেয়ে ফেলত!'

সেই চিল তো খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে, আর মেছুনির ঝুড়ির ভিতরে থেকে দুই পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। মেছুনি খালি তাদের কথাই ভাবছে, চিলের কথা আর তার মনে নেই। ঠিক এমনি সময় চিল তাকে দেখতে পেয়ে, ছোঁ মেরে তার মাথা থেকে ঝুড়ি নিয়ে পালাল।

সেই দেশের রাজার মেয়ে ছাদে বসে ছিলেন। দাসী তাঁর চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল।

রাজার মেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখছেন, এমন সময় তাঁর চোখে কী যেন পড়ল।

রাজার মেয়ে চোখ বুজে বললেন, 'দাসী, দেখ দেখ, আমার চোখে কী পড়েছে!'

দাসী কাপড়ের কোণ পাকিয়ে, তাতে থুতু লাগিয়ে, তাই দিয়ে রাজকন্যার চোখের ভিতর থেকে ভারি চমৎকার একটি ছোট কালো জিনিস বার করল।

রাজকন্যা বললেন, 'কী সুন্দর ! কী সুন্দর ! দাসী, এটা কী?'

দাসী বলতে পারল না সেটা কী। বাড়ির ভিতরের সকলে দেখল, কেউ বলতে পারল না সেটা কী। রাজা এলেন, মন্ত্রী এলেন, তাঁরাও বলতে পারলেন না সেটা কী।

তখন রাজা বড়-বড় পণ্ডিতদের ডাকিয়ে আনলেন।

তাঁদের কাছে এমন সব কল ছিল, যা দিয়ে পিঁপড়েটাকে হাতির মতন দেখা যায়। সেই কলের ভিতর দিয়ে তাঁরা দেখে বললেন, 'এটা তো দেখছি একটা ঝুড়ি, তার ভিতরে কতকগুলি মাছ আছে, আর দুজন লোক কুস্তি লড়ছে।'

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর কথা

এক পিঁপড়ে, আর তার পিঁপড়ী ছিল। পিঁপড়ী বলল, 'পিঁপড়ে, আমি বাপের বাড়ি যাব, নৌকা নিয়ে এস।' পিঁপড়ে একটি ধানের খোসা ভাসিয়ে নিয়ে এল। পিঁপড়ী তা দেখে বলল, 'কী সুন্দর

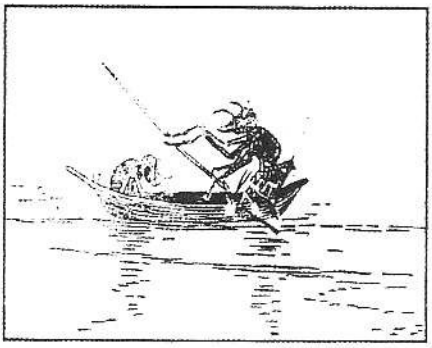

নৌকা ! এস পিঁপড়ে, আমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে চল।' পিঁপড়ে আর পিঁপড়ী ধানের খোসার নৌকায় উঠে বসে, নৌকা ছেড়ে দিল। খানিক দূরে গিয়ে সেই নৌকা চড়ায় আটকে গেল। তখন পিঁপড়ে বলল, 'পিঁপড়ী, আমিও ঠেলি, তুমিও ঠেল।'

আমার কথাও ফুরিয়ে গেল।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আমার কথাও ফুরিয়ে গেল
799513
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

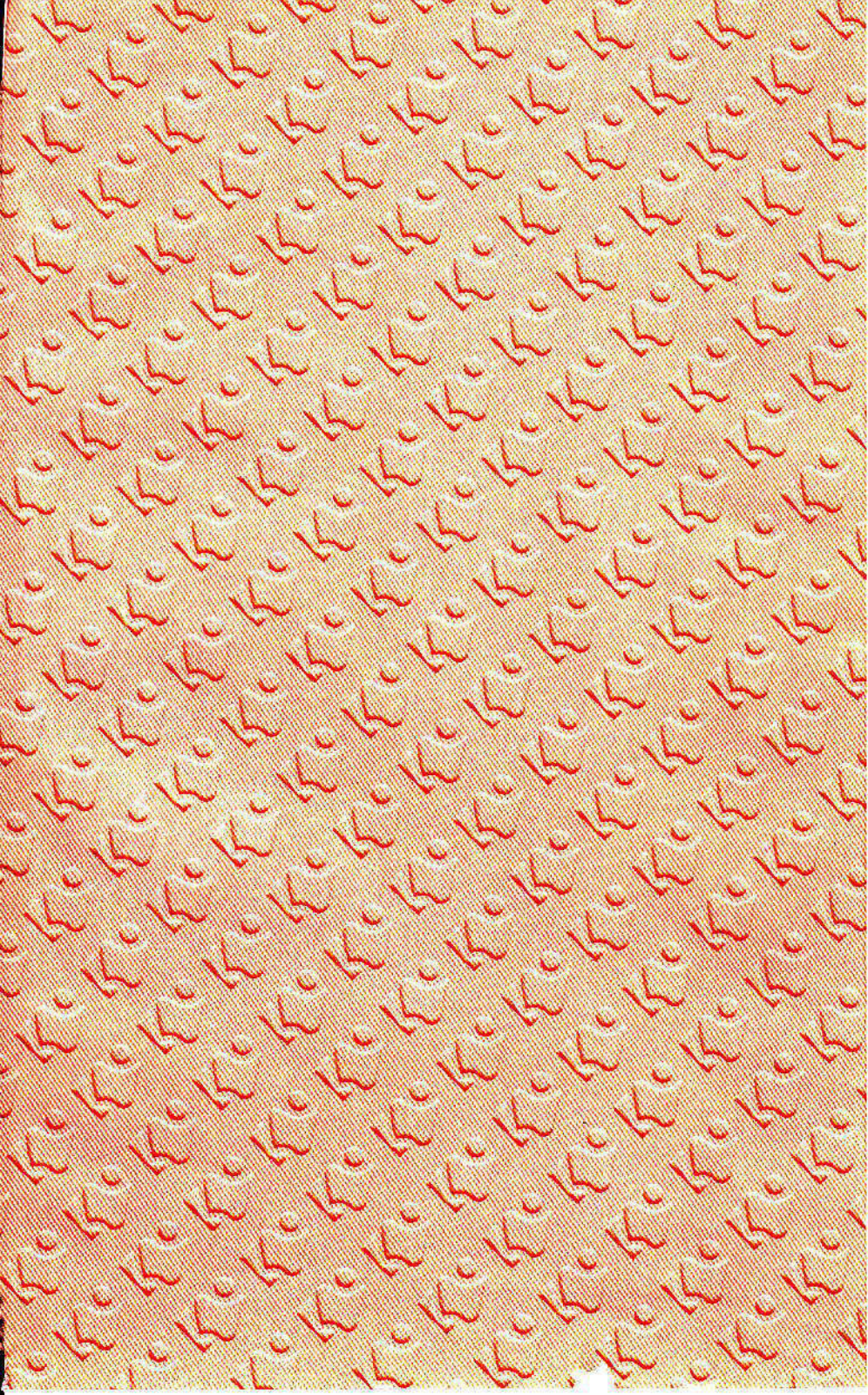

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র